আর এস এস বনাম ভারত

৫

ভারতের বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের উপর আগ্রাসন

সি পি আই (এম) প্রকাশনা

সূচীপত্র

বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের উপর আগ্রামন
—অমর ফারুকি/৩
ইতিহাসের যুগ নির্ধারণে বিকৃতিকরণ
— ড. আর পি বহুগুণা/১০
প্রাচীন বিজ্ঞান এবং হিন্দুত্ব
—প্রবীর পুরকায়স্থ /১৭
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর আর এস এস এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা
— অধ্যাপক পি. গোপীর্না/২৫
নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ — আর এস এস পন্থা/৩১

বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের উপর আগ্রাসন

অমর ফারুকি

হরিয়াণার মুখ্যমন্ত্রী এবং বরিষ্ঠ আর এস এস প্রচারক এম এল খাট্টার সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেন যে সরস্বতী নদী হল হিন্দুদের এক বিশ্বাসের স্থল (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৬ই অক্টোবর, ২০১৫)। সকল হিন্দুদের পক্ষ থেকে তাঁর এই কথা বলার অধিকার আছে কিনা অথবা তাঁর এই মত হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশ্বাসের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী কিনা এটি বিচার্য। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি, এটাও দাবি করা হচ্ছে হরিয়াণা এবং রাজস্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বর্তমান ঘাগগর নদীটি হল প্রাচীন সরস্বতী নদীর ধ্বংসাবশেষ, আর এই নদীটি হল অন্তপ্রবাহী। রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে এই দাবির সমর্থনে মিথ্যা ঐতিহাসিক প্রমাণ্য দলিল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হরিয়াণার যমুনানগর জেলার মুঘলওয়ালি গ্রামে মাটি কাটার (রেগার কাজে) সময় ২০১৫-এর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মাটির নীচে জল পাওয়া যায়। রাজ্য সরকারের কর্মকর্তারা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে দেন যে এটাই হল পবিত্র সরস্বতী নদীর আকাট্য প্রমাণ। ঐতিহাসিক কিংবা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মতামত পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। সংঘ পরিবারের রাজনৈতিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে ইতিহাসের পেশাগত দক্ষতাকেও উপেক্ষা করা হয়েছে।

হরিয়াণা সরকার কর্তৃক পবিত্র সরস্বতী নদীর ঐতিহাসিকত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০ কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণার মাত্র দুই সপ্তাহ পর যমুনানগর জেলার ঘটনা উন্মোচিত হয়। সরস্বতী নদী 'শুদ্ধ সংস্থান' প্রসঙ্গটি এবিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯০-এর দশক থেকে সুপরিচিত আর এস এস কর্মকর্তা দর্শনলাল জৈন-এর নেতৃত্বে পবিত্র নদী 'পুনরুজ্জীবন' আন্দোলনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

সঙ্ঘ পরিবারের নিকট গুরুত্বপূর্ণ দুটো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ইস্যু রয়েছে। প্রথমটি হল ভারতের প্রাচীনতম হরপ্পা সভ্যতা (এটি সিন্ধুসভ্যতা নামেও পরিচিত) সিন্ধুনদীর অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। এই নদী অববাহিকার একটি বিরাট অংশ বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত। আর এই অঞ্চলেই এই উপমহাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীনতম নগর সভ্যতাটি গড়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে সঙ্ঘ পরিবার হরপ্পা- সভ্যতার নাম সরস্বতী সভ্যতা (অথবা সরস্বতী- সিন্ধু- সভ্যতা) রাখার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করছে।

১৯৪৭ সালে ভারত- পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল মাত্র এবং এই বিভাজন এই উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সত্যিই বেমানান। হরপ্পা অঞ্চলের একটা ছোট্ট অংশ খনন করে গবেষণা চালানো হয়েছিল। কিন্তু এই সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল সিন্ধু, পাঞ্জাব (পূর্ব এবং পশ্চিম), হরিয়াণা, রাজস্থান, গুজরাট এবং উত্তর প্রদেশসহ বিস্তীর্ন অঞ্চলে। একেবারে পশ্চিম প্রান্তে উত্তর আফগানিস্থানে (আমু দরিয়া নদীর তীরবর্তী শয়টুমাইতে) একটি কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে, আর পূর্বাংশটি রয়েছে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার আলমগীরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিরাট অঞ্চলে আবিষ্কৃত স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে মিল রয়েছে। অতএব পন্ডিতগণ এই সকল ঐতিহাসিক স্থান সমূহের 'হরপ্পা সভ্যতা' নাম প্রদানে বর্তমানে প্রত্নতাত্বিক রীতিনীতিকে অনুসরণ করতেই অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কারণ হরপ্পা (পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাবের সাহিওয়াল জেলায় অবস্থিত) হল খনন কার্যের ফলে প্রথম আবিষ্কৃত স্থান। আর এখানে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক নির্দশনের উপর ভিত্তি করেই এর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে হবে। আর এই একই কারণে কিছু কিছু পন্ডিত এই সভ্যতাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' হিসাবেও চিহ্নিত করে থাকেন। ১৯২০-এর দশকের প্রথম পাদে প্রাথমিক স্তরে আবিষ্কৃত স্থানসমূহ এবং অঞ্চলের নামানুসারেই এই পরিচিতি লাভ করে। কারণ ভারতীয় উপমহাদেশে যে সকল উন্নত প্রাচীন নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রসমূহের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলোর সবই ছিল সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত (যেমন, মহেঞ্জোদারো)।

দ্বিতীয় ইস্যুটি আরো জটিল কারণ এর মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক যুগ নির্ধারণ পদ্ধতিকেই ব্যাপক ধ্বংস সাধন করা হচ্ছে। এটা নিশ্চিত করে বলা হচ্ছে যে পবিত্র সরস্বতী নদী অববাহিকা অঞ্চলকে নিয়ে 'সরস্বতী' সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যা পশ্চিমে সিন্ধু অঞ্চল থেকে পূর্বে গঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হরপ্পা সভ্যতায় আবিষ্কৃত স্থানসমূহের মধ্যে কয়েকটি ঘাগগর নদী সংলগ্ন হওয়ায় এগুলোকেই সরস্বতী সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে। সরস্বতী এবং যমুনা নদীর মধ্যেও (কয়েক শতক ধরে তার পূর্ব দিকে গতি পরিবর্তন) যোগাযোগের কথা বলা হচ্ছে এটা নিশ্চিত করতে যে বর্তমান হরিয়াণা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের মূল এলাকাটিই ছিল এই সভ্যতার অন্তর্গত। এই তত্ত্বের সুস্পষ্ট বক্তব্যটি উপস্থাপন করা হয়েছিল ডেভিড ফ্র্যাউলে নামক একজন আমেরিকান স্বঘোষিত সংস্কৃত পন্ডিতের বক্তব্য থেকে, যাকে ২০১৫ সালে বর্তমান বিজেপি সরকার পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত করেছিল এবং ভারতের ইতিহাস গবেষণা পরিষদের চেয়ারপার্সন (ওয়াই সুদর্শন রাও যিনি সঙ্ঘ পরিবারের 'দর্শন' - এর একজন একনিষ্ঠ প্রচারক) কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এই সংস্থার মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠা দিবসে ভাষণ দেওয়ার জন্য। পেশাদারি ঐতিহাসিক রূপে ডেভিড

ফ্র্যাউলের পৃথিবীর কোথাও কাজের এমন কোন স্বীকৃতি নেই, অথচ সরকারি অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হলঃ একজন আমেরিকান বলে এবং তার গায়ে সম্মানের তকমা মারা হল!

ফ্র্যাউলে তাঁর গ্রন্থ 'ঈশ্বর, সন্ত এবং রাজা ঃ প্রাচীন সভ্যতায় বৈদিক রহস্য' - এ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ঋগ্বেদে উল্লেখিত নদীসমূহের মধ্যে সরস্বতী ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী, 'প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ'। তিনি আরো বলেন, ঋগ্‌বেদ এবং বৈদিক ঐতিহ্য অনুযায়ী এই সভ্যতার লোকেদের বসতি গড়ে উঠেছিল সরস্বতী নদী অববাহিকায়। যমুনা নদী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল, 'এটি প্রথমে পশ্চিম প্রবাহী ছিল এবং পরবর্তীকালে পূর্ব দিকে অভিমুখ ঘুরিয়ে গঙ্গায় মিলিত হয় যেমনটা বর্তমান অবস্থায় রয়েছে। আর গঙ্গাও ছিল সরস্বতীর উপনদী। তাঁর মতে, 'প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম দিকে গঙ্গাও সম্ভবত পশ্চিমদিকে যমুনা নদীর মত প্রবাহিত হয়ে সরস্বতী নদীতে গিয়ে মিলিত হয়।' বলা হয়ে থাকে, সংস্কৃতভাষী বৈদিকগণ যারা সুবিস্তীর্ণ সরস্বতী নদী উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস করত তারাই ঋগ্‌বেদ রচনা করেছিল। তারপর ফ্র্যাউলে একটি উল্লম্ফন দিয়ে বললেন, 'সিন্ধু-উপত্যকার সংস্কৃতি হল বৈদিক পরবর্তী যুগের। সিন্ধু- উপত্যকা সংস্কৃতির প্রায় শেষ লগ্নে সরস্বতী প্রবাহ বন্ধ করেছিল' (এই অনুচ্ছেদের সমস্ত উদৃতি ফ্র্যাউলের বইয়ের প্রথম পার্ট- এর দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে নেওয়া)। তাঁর যুক্তি হল, " যদি সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের পরে ঋগ্‌বেদ রচিত হয়ে থাকে তাহলে কখন সরস্বতী নদী এতটা শক্তিশালী ছিল? আর সে কারণেই ঋগ্‌বেদের মত পবিত্র গ্রন্থে এই নদীকে এতটা গৌরবান্বিত করা হত না।' তাঁর অভিমত পেশাদারি ঐতিহাসিকদের দশকের পর দশক ধরে কালানুক্রমিক গবেষণার সঙ্গে সম্পূর্ণ বেমানান। কারণ তাদের গবেষণালব্ধ ফল হল: হরপ্পা সভ্যতার পতনের কয়েক শতক পর বৈদিক যুগের সূচনা হয়েছিল।

তাঁর কপট বুদ্ধিবৃত্তি এরপর দাবি করে যে ঋগ্‌বেদ রচনাকালের সময় কয়েকশ বছর পিছিয়ে দিতে হবে, আর তাই যদি না হয় তাহলে কয়েক হাজার বছর অথবা একটা বিবেচনাযোগ্য সময় প্রয়োজন যখন থেকে মানুষ পশুচারণ এবং কৃষিজীবী সমাজ (যেমনটা ঋগ্‌বেদে প্রতিফলিত হয়েছে) থেকে উন্নত নগরকেন্দ্রিক হরপ্পা সভ্যতায় উত্তোরণ ঘটায়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় অনুদানে 'বৈদিক কালানুক্রম: একটি পুনর্মূল্যায়ন- এর উপর একটি 'জাতীয় সেমিনার' অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত বিভাগের প্রধান তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে ঘোষণা করেন যে বৈদিক সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে যে সময়কাল গৃহীত হয়েছে তার চাইতেও প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বেদ রচিত হয়েছিল। কোন কোন বক্তা ৭৫০০ খ্রি: পূর্বাব্দ পর্যন্ত এই তারিখ পিছিয়ে নিয়ে গেছেন। এর অর্থ হল ঋগ্‌বেদের রচনা কাল স্বীকৃত তারিখ থেকে আরো ছয় হাজার বছরের প্রাচীন! প্রকৃতপক্ষে এটা কোন বিশ্বাসের বিষয় নয়: বলা হয় যে

এটা হল ঋগ্‌বেদে উল্লেখিত জ্যোর্তিবিজ্ঞানের প্রদত্ত ডাটার উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত এবং গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক সত্য।

১৯৯৪ সালে সুভাষ কাক নামে আমেরিকার এক কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ঋগ্‌বেদ এর স্বীকৃত কালানুক্রমকে চ্যালেঞ্জ করে 'দি এস্ট্রনমিক্যাল কোড অব্ দি 'ঋগ্ বেদ' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। মহাকাশের প্রকৃতি (সম্ভবত: বেদে উল্লেখিত যজ্ঞ বেদির নমুনা চিত্র) সংক্রান্ত নানা ধরনের তথ্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে তাঁর হিসেব মতো ঋগ্‌বেদ খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-৩০০০ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। যে জাতীয় সেমিনারে এই তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে ইতিপূর্বে ওরা এর সঙ্গে তিন থেকে চার হাজার বছর যোগ করেছিল। কারণ এই তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওরা আরো বেশি স্বাধীন ছিল।

ঐতিহাসিক কালানুক্রম নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বির্তক রয়েছে। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে পন্ডিত মহলে ব্যাপক পর্যালোনার পর মোটামুটি একটি সহমতে পৌঁছা গেছে, তবে বিতর্ক যা আছে তা মাত্র কয়েকশত বছরের— হাজার বছরেরও নয়। সুইস্ লেখক এরিখ ভন্ ডানিকেন - এর কথা কেউ মনে করতে পারেন, যিনি তাঁর মনোরঞ্জনকারী সর্বাধিক বিক্রিত 'চ্যারিয়ট অফ দি গডস্' (১৯৬৮) গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে অন্যান্য প্রাচীন স্মৃতি স্তম্ভগুলোর নির্মাণ শৈলীর মধ্যে পিরামিড মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন বহির্জাগতিক প্রাণীকূল দ্বারা নির্মিত। কিন্তু সঙ্ঘ পরিবার যা করবার চেষ্টা করছে তার পেছনে রয়েছে বদ মতলব এবং মারাত্মক বিদ্বেষ। গোবিন্দ পানসারে এবং এম এস কালবুর্গি,এরা দু'জনই প্রাচীন ভারতের যুক্তিবাদ এবং ঐতিহাসিক ধ্যান- ধারণা প্রচারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু এদের দু'জনকেই ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। আর উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

১৯৯০-এর দশকের বছরগুলো ছিল ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপর আদর্শগত আক্রমণের এক সংকটময় সময়, কারণ এই সময় সঙ্ঘ পরিবার আগ্রাসী রাজনৈতিক সংঘাতে নেমেছিল। ঠিক একইভাবে কিছু ভারতীয় আমেরিকায় একই রকম সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে কক্ ডেভিড ফ্রাউলের সঙ্গে 'সভ্যতার উৎস সন্ধ্যানে' নামে যৌথভাবে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে মেসোপোটোমীয় সভ্যতা সম্পর্কে ইতিহাসস্বীকৃত সমস্ত তথ্য প্রমাণাদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে ভারতবর্ষই হল 'সভ্যতার উৎস ভূমি'। এই ধরণের সৌখিন সূত্রায়ণ ইতিহাস রচনার সুবিদিত রীতিনীতি দ্বারা স্বীকৃত নয়।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে হলে প্রায় ৯০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে প্যালেস্তাইনে প্রাচীনতম খাদ্য-উৎপাদক মানুষের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনার প্রয়োজন। উত্তর ইরাকে খাদ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রসার ঘটতে আরো তিন হাজার বছর

লেগেছিল। এবং আরো আড়াই হাজার বছর অর্থাৎ ৩৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ ইরাকে নাগরিক জীবনের বিকাশ ঘটেছিল। দুই থেকে তিনশত বছরের মধ্যে দক্ষিণ ইরাকে উন্নত শহুরে সভ্যতা বিকশিত হয়। এই কালানুক্রম ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এখন এই সকল তারিখ নির্ধারণ করা হয় অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে। দক্ষিণ ইরাকে প্রাপ্ত এই সকল সাক্ষ্য প্রমাণাদির সঙ্গে সুমারীয় সভ্যতার টেরাকোটার উপর খোদাই করে সংরক্ষিত কীলিকাকার লিপিসমূহের মেলবন্ধন ঘটানো যেতে পারে। পশ্চিম এশিয়ায় খাদ্য উৎপাদকশ্রেণির উত্তরণে লেগেছিল প্রায় ছয় হাজার বছর। অর্থাৎ এটি ছিল প্রস্তর নির্মিত যন্ত্রপাতির (যাকে নব্যপ্রস্তর যুগ বলা হয়) ব্যবহার থেকে ধাতু নির্মিত জিনিসপত্রের ব্যবহার পর্যন্ত।

ভারতীয় উপমহাদেশে খাদ্য উৎপাদন শুরু হয় ৭০০০ খ্রি: পূর্বাব্দে। বালুচিস্থানের অন্তর্গত মেহেরগড়ে নব্যপ্রস্তর যুগের নির্দশন পাওয়া যায়। এছাড়াও নব্য প্রস্তর যুগের আরো কিছু প্রাচীন অঞ্চল বিন্ধ্য পর্বতের আশপাশে আবিষ্কৃত হয়েছে যার মধ্যে কয়েকটি মেহেরগড়ের সমসাময়িক।

হরপ্পা সভ্যতা বিবর্তিত হয় ২৬০০ খ্রি: পূর্বাব্দে এবং এর পরিনমন পর্যায়টি ঘটে ২৫০০ খ্রি: পূর্বাব্দ নাগাদ। এই পরিনমিত পর্যায়টি ২০০০ খ্রি: পূর্বাব্দ পর্যন্ত টিকেছিল এবং এই সভ্যতার আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটে খ্রি: পূর্ব ২০০০ থেকে ১৯০০ অব্দের মধ্যে। সাধারণত: এই উপমহাদেশের ইতিহাস আন্তর্জাতিক স্তরের পেশাদারি ঐতিহাসিকদের দ্বারা অনুমোদিত। কেন্দ্রীয় শহরসমূহের অবলুপ্তিকে অনেকে এই সভ্যতার পরিসমাপ্তির মূল কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম হল উন্নতমানের পোড়া ইটের ব্যবহার। হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংসের অনুসারি রূপে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর -পশ্চিমাংশে অপর একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের শুরু হয়— প্রত্ন- তাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ঋকবেদের তথ্য প্রমাণাদি অনুযায়ী ইতিহাসের এই পর্যায়ের নামাকরণ করা হয়েছে আদি বৈদিক যুগ (১৫০০ থেকে ১০০০ খ্রি: পূর্বাব্দ) এটি ছিল সম্পূর্ণ গ্রামীণ সভ্যতা যাতে মানুষের উপজীবিকা ছিল পশুপালনের সঙ্গে কিছু চাষবাস। ভাষাগত দিক থেকে এই সভ্যতার লোকেরা মূলত বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় কথা বলত। আর এটাই ছিল ঋগবেদের ভাষা। এছাড়া অন্যান্য ভাষাভাষি সম্প্রদায়ের মানুষও ছিল।

ঋগবেদের বিভিন্ন স্থানে ঘোড়ার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এটিই ছিল বৈদিক সংস্কৃত ভাষাভাষী মানুষের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। হরপ্পা সভ্যতায় গৃহপালিত পশু হিসাবে ঘোড়ার ব্যবহারের কোন প্রমাণ নেই। বিস্ময়ের অবকাশ নেই যে এখন এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটিই 'নির্মাণ' করবার চেষ্টা হচ্ছে। অবশ্য বর্তমানে এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে উপেক্ষিত। এন এস

রাজারাম 'দি ডিসাইফারড্ ইন্দাস স্ক্রিপ্ট' গ্রন্থে এই দাবি তুলেছিলেন যা বাতিল হয়ে গেছে। এটিই ঘটনা, সিন্ধু লিপির এখনও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি যদিও এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ লিপি। এই বইটির একটি ছবিতে হরপ্পায় একটি সিলমোহরে ঘোড়ার চিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। এটি একটি তামাশা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রাজারাম পরে স্বীকার করেছেন যে বইয়ের ছবিটি ছিল কম্পিউটারে করা একটি প্রতিমূর্তি। রাজারামের প্রশিক্ষণ ছিল গনিতে এবং কর্মজীবনের একসময় তিনি আমেরিকার নাসায় একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করতেন। তিনি ডেভিড ফ্র্যাউলের সঙ্গে যৌথভাবে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'অরিজিনস্ অব সিভিলাইজেশন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, ইতিহাসের উপর আক্রমণটা আসছে মূলত আবেগতাড়িত অনৈতিকহাসিকদের কাছ থেকে। আর এরা আমেরিকাকেন্দ্রিক প্রাকৃতি বিজ্ঞান কিংবা গণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং এটা কোন 'উদ্ভাবনীয় ইতিহাস গবেষণা' নয়।

আমাদের মনে রাখা দরকার, বৈদিক যুগে উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে পশুপালন এবং কৃষি- অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল নিজস্ব পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে খাদ্য সংগ্রহ শিকার এবং কৃষি- উৎপাদন— এই দুটো অথবা এই দুটোর সমন্বয়ে উদ্ভূত কোন পদ্ধতির মাধ্যমেই এই উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তা বিবর্তিত হয়েছিল। নব্যপ্রস্তর যুগের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের কালানুক্রম এবং ধাতুর ব্যবহারের যুগে উত্তরণে ভারতের মধ্য, দক্ষিণ, পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ মনিপুরের ন্যাপছিকে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ বসতি স্থাপন শুরু করে ১৭০০ খ্রি: পূর্বাব্দে। মেঘালয়ের সেলবালগিরি, আসামের সারুতুর এবং নাগাল্যান্ডে নব্যপ্রস্তর যুগের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে, কিন্তু এ অঞ্চলে এখনও ব্যাপক খনন কার্য এবং গবেষণা হয়নি। এই উপমহাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে আরো নিবিড় অনুসন্ধানের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। উত্তর ভারতের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে এই অঞ্চলের ইতিহাস গবেষণায় রাষ্ট্র উপেক্ষা করেছে যার ফলশ্রুতিতে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আর এটাই বিজেপি-র রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণে সুযোগ করে দিয়েছে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উত্তর ভারতের প্রাচীন ইতিহাস এবং বৈদিক যুগে আর্যদের ভারতে বসতি বিস্তারের কালানুক্রমনকে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব হিসাবে গণ্য করার একটা বদ্ধ সংস্কার রয়েছে। আর এর পশ্চাতে ভারতে আর্য জাতি সম্পর্কে উপনিবেশিক ধ্যান- ধারণা। সঙ্ঘ পরিবারের মতে, পবিত্র বেদের যুগের যারা আর্যদের বংশধর তারাই এই উপমহাদেশের প্রকৃত এবং আদি বাসিন্দা। আর তারাই হল শ্রেষ্ঠ জাতি : অনার্যদেরকেও ওদের আধিপত্যাধীনেই থাকতে হত। ঊনিশ শতকে উপনিবেশবাদীরা এই অভিমত ব্যক্ত

করে যে আর্যরা ছিল একটা জাতিগোষ্ঠী (আদিতে ভাষাতত্ত্ববিদগণ একটি ভাষাগোষ্ঠী রূপে চিহ্নিত করেছিলেন) এবং যে জাতি প্রথা তৈরি করা হয়েছিল এর সর্বোচ্চস্থানে ছিল ওরা। এই শতকের শেষ লগ্নে এই চিন্তাধারা পরিমার্জিত করে, পাকাপোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এর একটা বৈজ্ঞানিক প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।

স্পষ্টতই এটা বলা হয়ে থাকে যে, আর্যদের জৈবিক চরিত্রাবলী গাণিতিকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে (যেমনটা অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর বেলায় করা হয়ে থাকে)— যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানব দেহের নিরীক্ষা বা পরিমাপ। অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যানুযায়ী নাকের গড়ন এবং পরিমাপের তথ্য নিবন্ধীকরণ এবং প্রাপ্ত তথ্যের গড় নির্ণয়। আরোহ এবং অবরোহ পদ্ধতিতে এই গড় নির্ধারণ করতে গিয়ে কোন একটি জাতিগোষ্ঠীর গোষ্ঠীগত উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে তার অবস্থানটি কোথায় সেটি উল্লেখ করা যাতে (বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের আর্যদের ক্ষেত্রে) আর্যদের নাম থাকবে একেবারে উপরে। আর্যদের প্রধান জাতিগত বৈশিষ্ট্য সমূহ হল ঃ গায়ের রঙ পরিষ্কার, লম্বাটে গড়ন, প্রশস্ত কপাল, উন্নত ও তীক্ষ্ণ নাক এবং পাতলা ঠোঁট। ভারতীয় প্রেক্ষিতে এইছ, এইছ, রিজলের মতো উপনিবেশিক নৃ-তত্ত্ববিদগণ জাতির সঙ্গে গোষ্ঠীকে এক করে ফেলেন। ভারতে উচ্চ বর্ণের লোকেরা তাদের আর্য জাতি- গোষ্ঠীগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য সমগোত্রীয় বিবাহ রীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে।

আর্যদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ন্যাৎসী জার্মানীতে চরমে পৌঁছেছিল। হিটলার একট আইন দ্বারা (এপ্রিল, ১৯৩৩) সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অনার্যদের বহিষ্কার করেন এবং সঙ্গে তাদের জার্মান নাগরিকত্বও হরণ করা হয়। এর সঙ্গে ব্যাপক হারে চলতে থাকে ইহুদী এবং দাস নিধন। পাশাপাশি চলতে থাকে ঐতিহাসিক মগজ ধোলাই প্রক্রিয়া। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে এই রকম চরম পন্থা গ্রহণ সম্ভব নয় এবং এর অনুমতিও মিলবে না। কিন্তু দেশের গণতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে মানুষের স্মৃতি থেকে যেন চিরাচরিত ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনা মুছে ফেলতে না পারে এবং অতীতের কোন ঘৃণ্য স্মৃতি যেন সে স্থান অধিকার না করে।

এই রকম ভাবনা পোষণ করা ভুল হবে যে ভারতের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সঙ্ঘ পরিবারের অনৈতিহাসিক দাবিই হল বিকল্প 'ব্যাখ্যা'। ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসাবে এগুলোর গ্রহণযোগ্যতা নগন্যই। আরো গুরুত্ব সহকারে বলা যায়, এই দাবিসমূহ ক্রমবর্ধমানভাবে করা হচ্ছে উগ্র ভাষায় যা বিপজ্জনক ও কুৎসিত এবং সন্ত্রাসের বীজ বপনকারী। রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক সক্রিয়ভাবে সমর্থিত ইতিহাসের উপর এই ধরণের মারাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ একমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমেই সম্ভব।

ইতিহাসের যুগ নির্ধারণে বিকৃতিকরণ

ড. আর পি বহুগুণা

প্রশ্ন ঃ ১ ঃ ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে আর এস এস-এর দৃষ্টিভঙ্গি কিভাবে উপনিবেশিক যুগ- বিভাজন প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত? এই যুগকে 'মুসলমান শাসনের যুগ' বলে চরিত্রায়িত করা কী ভুল?

উত্তর-১ ঃ ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে উপনিবেশিক ঐতিহাসিকগণ ভারতের প্রাচীন যুগকে 'হিন্দু ভারত' এবং মধ্যযুগের ইতিহাসকে 'মুসলমান শাসন'- এর যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। আর এস এস ভাবাদর্শে এবং আর এস এস প্রভাবিত ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের এই উপনিবেশিক যুগ-বিভাজন প্রকল্পকে গ্রহণ করেছেন কারণ ওদের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচীর সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। উপনিবেশিক ঐতিহাসিকদের মতো আর এস এসও বিশ্বাস করে যে ভারতে মধ্যযুগের সূচনা হয় উত্তর ভারতে মুসলিম আক্রমণ এবং বিজয়ের মধ্য দিয়ে। আর এস এস- এর নিকট ত্রয়োদশ এবং সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় ভারতে মুসলমান শাসনের যুগ কারণ সুলতানি এবং মুঘল শাসকগণ ছিলেন ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। স্বাভাবিকভাবে মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে এই ধরণের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃত উপস্থাপনা এবং ইতিহাসের যুগ- বিভাজন সংক্রান্ত বিষয়ে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। নিচের ঐতিহাসিক সত্য এবং যুক্তিসমূহ বিবেচনা করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবেঃ

* যুগ বিভাজনে শাসকশ্রেণির ধর্ম কোন ভিত্তি হতে পারে না। ইতিহাসের এক যুগ থেকে অপর যুগে উত্তরণে শাসকশ্রেণির ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। প্রাচীন যুগের সকল শাসকগণ হিন্দু ছিলেন না। প্রাচীন রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশোক মোটেই হিন্দু নয়, ছিলেন বৌদ্ধ। প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ ছিল সুদূরপ্রসারী আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ফল, যা শুরু হয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকে, গুপ্ত পরবর্তী যুগে এবং তুর্কীদের আগমনের পরে নয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আঞ্চলিক রাজ্য মূহ, সমাজ এবং সংস্কৃতির বিকাশ। কোন কোন অঞ্চলে পশুপালন থেকে কৃষি উৎপাদনের যুগে উত্তোরণও সম্পর্ক যুক্ত ছিল। অন্তর্বাণিজ্য এবং বর্হিবানিজ্যের সঙ্গেও এই সকল পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নগদ অর্থনীতির বিষয়টিও এর বাইরে ছিল না। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমতে শুরু করল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনরুত্থিত হতে লাগল। এই যুগে দক্ষিণ ভারতে ভক্তি আন্দোলন একটি পরিপক্বরূপ গ্রহণ করে। ব্যবসায়ী, সুফী, পরিব্রাজক ইত্যাদি বহু মুসলিম সম্প্রদায় ভারতে আসে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস

করতে থাকে। ঐ সকল অঞ্চলের অধিকাংশই ছিল হিন্দু শাসকদের দ্বারা শাসিত। একাদশ এবং দ্বাদশ শতকে ভারতে তুর্কী আক্রমণ ঘটে এবং তুর্কী বিজয়ের পরবর্তীকালে নতুনভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ভারতের ইতিহাস আবার নতুন ধরনের মধ্যযুগের সূচনা করে।

* যদিও এমনটি ভাবা হয় যে ইতিহাসের যুগ নির্ধারণে শাসকশ্রেণির ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাহলে গুরুত্ব সহকারে এটিও লক্ষ করতে হবে যে মধ্যযুগের সকল শাসকরা মুসলিম ছিল না। দিল্লির সুলতানি শাসকগণ, আঞ্চলিক সুলতানগণ এবং মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকগণ ছিলেন মুসলিম, কিন্তু বিজয়নগর সাম্রাজ্য এবং উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত রাজ্যসমূহ ছিল অ-মুসলিম শাসিত। সর্বোপরি, প্রাথমিক স্তরে সামরিক সংঘর্ষ এবং বিজয়ের পর হিন্দু- শাসক অভিজাতশ্রেণি সুলতানি এবং মুঘল শাসকদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। আকবরের শাসনকাল থেকে রাজপুতগণ মুঘল শাসকগোষ্ঠীর অখন্ড সত্ত্বায় পরিণত হয় এবং অনেক রাজপুত প্রধান মুঘল সামরিক বাহিনী এবং প্রশাসনে বংশানুক্রমে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। আকবরের রাজত্বের শেষের দিকে রাজা মান সিং সর্বোচ্চ ৭ হাজারীজাত পদমর্যাদার মুঘল আভিজাতের পদমর্যাদায় উন্নীত হন। জাহাঙ্গির এবং শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল রাজদরবারে হিন্দু মনসবদারদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই ধারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। বিপরীতে আর এস এস- র অপপ্রচার হল মুঘল প্রশাসন থেকে হিন্দুদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। যারা উত্তরাধিকার বলে কিছু উচ্চপদ পদ লাভ করেছিল। শাজাহানের রাজত্বকাল থেকে এমনকি মারাঠাগণও মুঘল অভিজাত পদ লাভ করতে থাকে। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে (আকবরের শাসনকালে) ৫০০ পদমর্যাদার ৯৮ জন অভিজাতের মধ্যে ২২ জন ছিলেন হিন্দু অর্থাৎ মোট মুঘল অভিজাতদের ২২.৫ শতাংশ। ঔরঙ্গজেবের শাসনের দ্বিতীয়ার্ধে (১৬৭৯- ১৭০৭) মোট ৪৮৬ জন অভিজাতের মধ্যে হিন্দু অভিজাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১০৫ (৩১.৬ শতাংশ) জনে। গ্রাম, অঞ্চল এবং প্রাদেশিক জমিদারগণের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। মূলত এদেরকে নিয়েই ছিল মুঘল শাসকশ্রেণি।

প্রশ্ন - ২ ঃ আর এস এস চিত্রায়িত মধ্যযুগের ইতিহাস মানে চিরায়ত হিন্দু- মুসলিম দ্বন্দ্ব— এই তত্ত্ব ইতিহাসের মিথ্যেকরণ নয় কি?

উত্তর-২ ঃ আর এস এস কর্তৃক ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসকে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্বের ইতিহাস বলে প্রচার কলঙ্কজনক, কারণঃ

হিন্দু- মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধ হল আধুনিক উপনিবেশ যুগের সৃষ্ট ঘটনা। এই সব ঘটনাকে মধ্যযুগের বলে উপস্থাপিত করা যাবে না, কারণ আধুনিক যুগের যে সকল ঘটনাপ্রবাহে এই বিরোধের উদ্ভব তা মধ্যযুগে ছিল না। ঐ সময় রাজপুতদের সঙ্গে তুর্কীদের, রাজপুতদের সঙ্গে মুঘলদের, মুঘলদের সঙ্গে মারাঠাদের এবং মুঘলদের সঙ্গে শিখদের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এই বিরোধ ছিল প্রধানত শাসকগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক এবং আঞ্চলিক

সীমা সম্প্রসারণের উচ্চাকাঙ্খাকে নিয়ে। এক্ষেত্রে ধর্ম কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। সুলতানী এবং মুঘল শাসকগণ সমভাবেই তাদের মুসলিম প্রতিপক্ষ এবং বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুর হাতে দমন করত। ঔরঙ্গজেব বিজাপুর এবং গোলকুন্ডা দখল করেছিলেন যেখানকার শাসকরা ছিলেন সুলতানবংশীয় মুসলিম।

প্রাথমিক পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংঘর্ষ সবসময়ই রাজনৈতিক সংহতি এবং সহযোগিতার পরিপন্থী। সুলতানী শাসকগণ তুঘলক বংশের রাজত্বকাল থেকেই হিন্দু প্রধানদেরকে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ করতে থাকেন। আঞ্চলিক স্তরের সুলতানীগুলোতে বহু রাজপুত প্রধান শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলোতে সামরিক এবং প্রশাসনিক পদে মারাঠাদের নিয়োগ করা হত। মুঘল শাসকশ্রেণির সঙ্গে রাজপুতদের এমন গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল যে মুঘল রাষ্ট্রকে বলা হত মুঘল রাজপুত মৈত্রী জোটের রাষ্ট্র।

* শাসকশ্রেণির স্তরেও হিন্দু এবং মুসলিম শাসকদের মধ্যে বিরোধ এবং সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করি। এই সমস্ত কাজকর্ম রাজনৈতিক এবং সামরিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখেই করা হত। কিন্তু কৃষক এবং শিল্পীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে 'হিন্দু' ও 'মুসলিম' এই ধর্মীয় পরিচিতির কোন অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং সেখানে হিন্দু- মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন প্রশ্নই উঠত না। এই ধরনের ধর্মীয় পরিচিতি সার্বজনীনরূপ পরিগ্রহ করে এবং তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছায় একমাত্র আধুনিক যুগে যা সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্তরে গিয়ে পৌঁছায়।

* মধ্যযুগের বহু হিন্দু শাসকদের দ্বারা গৃহীত প্রশাসনিক এবং ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি-মালার দ্বারা সুলতানী এবং মুঘল শাসন ব্যবস্থা প্রভাবিত হয়েছিল। অধিকাংশ হিন্দুশাসক এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের রাজসভার সংস্কৃতি এবং রাজনীতি পারশ্য দেশীয় এবং ইসলামীয় আদব-কায়দা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অপরদিকে, মুঘল সম্রাটগণ তাদের রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ভারতীয় নিয়ম-কানুন, প্রতীক ও ধর্মীয় রীতিনীতি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

প্রশ্ন- ৩ ঃ আর এস এস কেন মধ্যযুগে হিন্দু নিগ্রহ এবং মুসলিম নৃশংসতার ছবি চিত্রায়নে অন্যায় করেছিল?

উত্তর - ৩ ঃ এই ধারনা ঐতিহাসিক সত্য বহন করে না। সত্য হল নিম্নরূপ ঃ

মন্দির ধ্বংসের বিষয়ে যতটুকু বলা যায়, এটি সত্যি যে সুলতানী এবং মুঘল যুগে কয়েকজন শাসক বিদ্রোহী দলপতিদের শাসনাধীন অঞ্চলে বেশ কিছু মন্দির ভাঙ্গেন বা ধ্বংস করেন। বিশেষত সেই সকল মন্দিরসমূহই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল যেগুলোকে তাদের শত্রুরা পৃষ্ঠপোষকতা করত। রাজনৈতিক দিক থেকেও ঐ সকল মন্দিরসমূহের গুরুত্ব ছিল। আমাদের কাছ এমন অনেক উদাহরণ আছে যে ঔরঙ্গজেবসহ অনেক মুঘল শাসক বহু মন্দির নির্মাণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ব্রজ অঞ্চলে মন্দির নির্মাণে মুঘল শাসকগণ পৃষ্ঠ-পোষকতা করেছেন, এর বহু তথ্য প্রমাণাদি রয়েছে। বহু বৈষ্ণব এবং নাথপন্থীদের পবিত্রস্থান সংস্কারে মুঘল শাসকরা

অর্থ সাহায্য করেছেন। মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুরে ভগবান ভিত্তাল এর মন্দির নির্মাণে বিজাপুরের সুলতানগণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট একটি জটিল বিষয়। এটা মুসলিম শাসকদের একমাত্র হিন্দু- বিরোধী মনোভাব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। উত্তর ভারতে কিছু বিখ্যাত মন্দির ধ্বংসের জন্য ঔরঙ্গজেব দায়ী ছিলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ ভারত যেখানে তিনি তাঁর রাজত্বকালে দীর্ঘ ২৬ বছর অতিবাহিত করেছিলেন সেখানে তিনি এই নীতি অনুসরণ করেন নি। অধিকাংশ প্রাচীন মন্দির এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এলাহাবাদের সোমেশ্বরনাথ মহাদেব মন্দির, বেনারসের জাংগুম বাড়ি শিব মন্দির এবং গুয়াহাটিতে উমানন্দ মন্দির নির্মাণে ঔরঙ্গজেব অর্থ সাহায্য করেছিলেন — এরূপ প্রমাণও রয়েছে। এই যে তাঁর মন্দির ধ্বংস করা এবং মন্দির নির্মাণ করা এই দুই কাজের পেছনে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা কঠিন রাজনৈতিক হিসেব- নিকেশই ছিল প্রধান।

* প্রাক ফিরোজ তুঘলক যুগে দিল্লির সুলতানগণ অমুসলমানদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেছিলেন বলে কোন প্রমাণ নেই। ১৫৭৯ খ্রি: আকবর জিজিয়া কর সম্পূর্ণরূপে তুলে দিয়েছিলেন। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব এই কর ব্যবস্থা পুনরায় চালু করেন, এর অর্থ হল তাঁর শাসনের প্রথম ২২ বছর তিনি এই কর সংগ্রহ করেন নি। ঔরঙ্গজেব পরবর্তী যুগে জিজিয়া কর সংগ্রহ বাতিল করা হয়েছিল এবং এই কর আর পুনরায় ধার্য করা হয়নি।

* ইসলামে ধর্মান্তকরণ সম্বন্ধে বলতে গেলে, সকল সচেতন মননশীল ঐতিহাসিকগণ বর্তমানে মনে করেন যে ধর্মান্তকরণের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। অধিকাংশ মুসলিম শাসক এবং অভিজাত শ্রেণি ধর্মান্তকরণে এতটা আগ্রহী ছিলেন না। এটি বলা ভুল হবে যে একটা বিশাল সংখ্যক হিন্দুকে জোর করে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে বিশাল সংখ্যক কৃষক এবং শিল্পী ধর্মান্তকরণের আওতায় এসেছিল ওরা আধুনিক অর্থে 'হিন্দু' ছিল না। এ নিয়ে বির্তক তোলা ভুল যে যারা মুসলমান হয়েছিল তাদের অধিকাংশ প্রকৃতই হিন্দু ছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটাকে 'ধর্মান্তকরণ' না বলে মুসলিমীকরণ' বলাই শ্রেয়। 'ইসলামীকরণে কোন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ছিল না। এটা ছিল ঐশ্লামিক সংস্কৃতি গ্রহণের একটা মন্থর প্রক্রিয়া যা ঘটার পেছনে জটিল আর্থ- সামাজিক এবং বাস্তুতান্ত্রিক কারণ বর্তমান। এর অন্যতম একটি হল উপজাতি পশুপালক সম্প্রদায়ের কৃষি উৎপাদক শ্রেণিতে রূপান্তর। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে এই রূপান্তরের যুগে যে অঞ্চল এবং সম্প্রদায় ভক্তি আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু-পন্থীতে পরিচিতি লাভ করে এবং যারা সুফী মুসলিম মতাবলম্বী পরিণামে ওদের ঐশ্লামিকরণ ঘটে। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে ইসলাম ধর্মের মত হিন্দু ধর্মেরও প্রভাব ছিল। পাঞ্জাব, বাংলা এবং দেশের অন্যান্য প্রান্তে মুসলিম সম্প্রদায়ের কৃষক সমাজের মধ্যে বৃদ্ধি এবং বিস্তারকে এইভাবেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

* জাতপাতের নামে অত্যাচারকেও ধর্মান্তকরণের প্রশ্নে উপেক্ষা করা যাবে না। কৃষক এবং

শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশ তথাকথিত নিচু-জাত বলে জাতিগত শোষণের শিকার হয়েছিল। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, অন্তত তত্ত্বগতভাবে হলেও, তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও, একে অপরের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্যই তারা অনুভব করতো না।

* কৃষক এবং কারিগরশ্রেণির ধর্মীয় পরিচিতি দিয়ে তাদের শোষণের মাত্রার হেরফের ঘটত না। মুসলমান কৃষক এবং কারিগরদেরকেও মুঘল সম্রাটকে একই পরিমাণ ভূমিরাজস্ব এবং উৎপাদন কর দিতে হত এবং এর অধীন ভূম্যাধিকারীদের স্তর জায়গিরদার থেকে জমিদার এবং চৌধুরী বা গ্রাম্যমোড়ল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটি অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে যে মধ্যযুগের ভারতে সমস্ত রাজ্যই প্রাচীন এবং পরবর্তীকালে রাজপুত রাজ্যসমূহ, চোল সাম্রাজ্য এবং এর উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত রাজ্যসমূহ, দিল্লির সুলতানি শাসক এবং তার উত্তরাধিকারীগণ, বিজয়নগর সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য, মারাঠা, শিখ এবং জাঠ রাজ্যসমূহ— কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত শষ্য আদায় করতে নগ্নভাবে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করত। এই সকল রাজ্যসমূহের কোনটিই হিন্দু অথবা মুসলমান রাজা কর্তৃক শাসিত হোক না কেন প্রজাবৎসল ছিল না। মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজের বিরোধ হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে ছিল না, বিরোধ ছিল একদিকে উদ্বৃত্ত- আদায়কারী রাজ্য এবং হিন্দু- মুসলিম শাসকশ্রেণি (তাদের ধর্মীয় গুরুদের দ্বারা সমর্থিত), অপরদিকে ছিল শোষিত এবং নির্যাতিত কৃষক এবং কারিগর শ্রেণি। হিন্দু কিংবা মুসলিম মূলত শোষণের শিকার ছিল কৃষক এবং কারিগর শ্রেণি। আর এস এস বর্ণিত হিন্দু 'নিপীড়িন' হল একটি সাম্প্রদায়িক অলীক কল্পনা, যার কোন ঐতিহাসিক বাস্তবতা নেই।

* সর্বশেষ, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, বহু হিন্দু শাসকগোষ্ঠী মুঘল শাসনে উপকারপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং মুঘল শাসনকে সংহত করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে মুঘল সেনাপতি ছিলেন আর কেউ নয় অম্বরের রাজা মান সিংহ। আকবরের শাসনকালে রাজা মান সিংহই বৃন্দাবনে কৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাণা প্রতাপ সিংহ তাঁর জীবনে শেষ কুঁড়ি বছর আরাবল্লী পাহাড়ের জঙ্গলে কাটিয়েছিলেন মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধে। আর একমাত্র রাজা মানসিংহই ছিলেন একজন অগ্রণী মুঘল অভিজাত ও সামরিক প্রধান যিনি তাঁর সমসাময়িক কালে সবচেয়ে শক্তিশালী হিন্দু প্রধান ছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বৈষ্ণব প্রচারকগণ এবং ধর্মস্থানসমূহ গৌরবোজ্জ্বল স্থান গ্রহণ করেছে বলে সমসাময়িক বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে জানা যায়। অনেক রাজপুত এবং তাদের কবিগণ হলদিঘাটের যুদ্ধকে দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী কচ্ছওয়াস এবং শিশুদীয় রাজপুত বংশের যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। ঐ সময়কার রাজপুতদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পদমর্যাদা, বীরত্ব, উত্তরাধিকার, ভূমির প্রতি আকর্ষণ এবং অনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুসলিম শাসকদের সঙ্গে বিরোধকে এই সকল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে পরস্পর সহযোগিতা, বৈবাহিক সম্পর্ক ইত্যাদির প্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। দ্বন্দ্ব এবং সহযোগিতার সম্পর্ক নির্ধারণে ধর্ম খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে অম্বরের মীর্জা রাজা জয় সিংহ দাক্ষিণাত্যের গভর্ণর ছিলেন এবং শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুঘল সেনাপতি ছিলেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন মেবারের রাজা যশবন্ত সিংহ, যিনি গুজরাট ও মালওয়ার গভর্ণর এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তে মুঘলবাহিনীর সেনাপতি ছিলেন।

* বহু হিন্দু ধর্মগুরু এবং শাসকশ্রেণি মুসলমান শাসনে নিপীড়িত হওয়ার চাইতে সম্পদশালী হয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, ব্রজ এবং অযোধ্যা অঞ্চল একেবারেই মুঘল সাম্রাজ্যর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত থেকেও বৈষ্ণব ভক্তিবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

প্রশ্ন- ৪ ঃ আর এস এস কেন মধ্যযুগকে মুসলিম শাসনাধীনে 'অন্ধকার' এবং হিন্দু সংস্কৃতির ধ্বংসের যুগ বলে অঙ্কিত করেছে?

উত্তর - ৪ ঃ উপনিবেশিক ইতিহাস রচনা পদ্ধতির উপর গভীরভাবে নির্ভরশীল আর এস এস ভাবাদর্শ ভারতে মধ্যযুগের সমন্বয়বাদী ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ব্যাপক ও বৈচিত্রময় ধারাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা এবং বিকৃত করেছে। আর এস এস এর এই অজ্ঞতা এবং ইতিহাস সম্পর্কে বিকৃত ধারণা নিম্নলিখিত ঘটনাগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে ঃ

* আধুনিক জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে বর্তমান পৃথিবীতে জাতিরাষ্ট্র গড়ে উঠে যা প্রাক্ আধুনিক ভারতে ' দেশ' এবং 'বিদেশ' সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা থেকে মৌলিকভাবেই পৃথক। আক্রমণ, সামরিক বিজয়, ভয়ঙ্কর আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব, প্রাদেশিক ও স্থানীয় পরিচিতিসত্তা, যোগাযোগের মাধ্যম এবং অন্যান্য উন্নয়নকার্যাদি বিষয়ে প্রতিনিয়ত দৃষ্টিভঙ্গির ভাঙ্গা গড়া চলেছে। ঐ সময় দেশপ্রেমের ভাবনা ছিল অন্যরকম অর্থাৎ বর্তমান সময়কার জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেম থেকে ভিন্ন। আরব, তুর্কী, আফগান, মঙ্গল এবং মুঘলরা এদেশে বিভিন্ন যুগে ব্যবসায়ী, পরিব্রাজক, সুফী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী এবং বিশেষত আক্রমণকারী রূপে ভারতে প্রবেশ করেছে। এই আক্রমণ ভয়ঙ্কর রকম লক্ষ্য করা যায় মধ্য এশিয়ার উপজাতিদের অভিপ্রয়াণে যাদের সমাজব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল। একসময় ওরা এই ভারতভূমিতে বসতি স্থাপন করে এবং এই দেশকে তাদের মাতৃ-ভূমি বলে মনে করত, তাদেরকেও বিদেশি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়টা ছিল রাজনৈতিক এবং সামরিক সংঘাতের যুগ যা প্রতিপক্ষের প্রতি নেতিবাচক সংস্কৃতির জন্ম দেয়। ভারতীয় শাসন কাঠামোয় উচ্চকোটির ব্যক্তিবর্গ এবং রাজ দরবারের নিবন্ধকগণ মুসলিম শাসকশ্রেণির শান্তির সময়কার দূত হিসাবে কাজ করতেন। মুসলিম শাসক এবং অভিজাতশ্রেণিও ধীরে ধীরে ভারতীয় সামাজিক রীতি-নীতি, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যাদি রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

* ক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্র সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেতে থাকে— ধর্ম, চিত্র-শিল্প এবং স্থাপত্য কর্ম, ভাষা, সাহিত্য, রাজদরবারি সংস্কৃতিতে। সুলতানী যুগের বহুসংস্কৃত রচনা সুলতানদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকরা ব্রাহ্মণ-পূজিত দেবদেবীদেরও সমদৃষ্টিতে যে দেখতেন তার বহু উদাহরণ সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে রয়েছে।

* অপরদিকে, মোটামুটি তুঘলক বংশের রাজত্বকাল থেকে আমরা দেখতে পাই পারস্পরিক

ধর্মীয় সমন্বয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১) হোলি উৎসবে যোগদান করেন এবং জৈন সন্ন্যাসী ও নাথপন্থী যোগীদের সঙ্গে ধর্মীয় আলোচনা করতেন। এই পারস্পরিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায় আঞ্চলিক সুলতান এবং মুঘলদের শাসনকালে। আমীর খসরু তাঁর 'নূহ সিফির' নামক রচনায় দেশপ্রেমের নিদর্শন রেখেছিলেন ভারতের জলবায়ু, ভাষা, বিশেষত সংস্কৃত ভাষা, সাধারণ মানুষ এমনকি পশু- পাখিরও উচ্চ প্রশংসার মাধ্যমে। এটিও উল্লেখ করা দরকার যে ভারতবর্ষের মানুষকে 'হিন্দু' অভিধায় ভূষিত করেছিল আরব এবং ইরাণীয়গণ। একমাত্র ওরাই প্রথম এই অঞ্চলের মানুষের ক্ষেত্রে 'হিন্দু' শব্দটি ব্যবহার করেন। আর ক্রমান্বয়ে প্রথম রাজপুত ও অন্যান্য আঞ্চলিক অমুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং তার পর উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিজেদেরকে 'হিন্দু' বলে পরিচয় দিতে থাকে। হিন্দু এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময় ব্যতীত এটা কখনোই সম্ভব হত না।

* সমন্বয়বাদী ভাবধারা শুরু হয় সুলতানী যুগে। স্থাপত্য, সংগীত এবং সাহিত্যে এটি আরো ব্যাপকতা লাভ করে মুঘল শাসনে এবং প্রাদেশিক সুলতানদের অধীনে। সংগীতের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবদান রাখেন আমীর খসরু। ভারতীয় সামাজিক পরিবেশেই আদি চিস্তি সুফী সম্প্রদায়ের 'সমা' বা সমবেত সংগীতের চর্চা করত। পরবর্তী সুলতানী শাসন থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের পার্শি ভাষায় অনুবাদ শুরু হয়। আকবর একটি অনুবাদ ব্যুরো স্থাপন করেন এবং মহাভারতসহ বহু সংস্কৃত রচনা পার্শিভাষায় অনুবাদ করেন। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীর একটি বিরাট অংশ হিন্দু ধর্মের বর্ণনায় ব্যয় করেন যাতে তাঁর হিন্দু ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। অপর গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের উদাহরণ হল মুঘল যুগে উর্দু ভাষার বিকাশ।

* সর্বশেষ কিন্তু গুরুত্ব হীন নয়,ধর্মীয় সমন্বয় হল হিন্দু-মুসলিম মিলনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সুফি এবং ভক্তি আন্দোলন হিন্দু- মুসলিম ঐক্যকে শক্তিশালী করে এবং পরস্পরের মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সুফিদের ধর্মীয়স্থানগুলো হিন্দু- মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। অপরদিকে, গোগা চৌহানের মত লোকায়াত দেব- দেবী গুগা পীর হিসাবে পূজীত হতে থাকে। বহু সুফি সন্তদের সঙ্গে নাথপন্থী যোগী, সন্ত এবং বৈষ্ণবদের ভাব বিনিময় ঘটে। হিন্দবি সুফি লেখকগণ তাদের রচনায় স্থানীয় ভাষা ও বিষয়কে প্রাধান্য দিতেন এবং ধর্মীয় কল্প-কথার মাধ্যমে তাঁদের ভাবধারা প্রচারিত হত। ভারতে মিশ্র ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশে আকবরের সুলই-ই- কুলের ভাবনা, দারা সিকোহ কর্তৃক ঐশ্লামিক অতিন্দ্রীয়বাদের ব্যাখ্যা এবং উপনিষদীয় দর্শনের স্মরণীয় অবদান রয়েছে।

* এসবই হল ইতিহাস পর্যালোচনার পথ যা আর এস এস আজ মুছে ফেলতে চাইছে।

প্রাচীন বিজ্ঞান এবং হিন্দুত্ব

প্রবীর পুরকায়স্থ

বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ হল ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি। নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য সম্পর্কে ভারতীয় সংবিধানের ৫১ ক (জ) ধারায় বলা হয়েছে, ... বৈজ্ঞানিক চেতনা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধিৎসা এবং সংস্কারের মানসিকতার বিকাশ ঘটাও।"

সম্প্রতি সারা দেশের প্রথম সারির ১০৭ জন বিজ্ঞানী 'অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধির পরিবেশ এবং বিরুদ্ধ মত দমন'- এর বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী মহলে যে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠে তাতে যোগদান করেন। বিবৃতিতে ওঁরা দেখিয়েছেন যে এটা পুরোপুরি নির্দেশাত্মক নীতির পরিপন্থী.... " আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা অযৌক্তিক এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাবনায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত।"

আর এস এস এবং তার অনুগামীরা আর্যযুগের ভারতবর্ষকে তাদের চিন্তাভাবনা মত 'শ্রেষ্ঠত্ব' দানে আগ্রহী। এরা বেদের বিভিন্ন ভাবনাকে বিজ্ঞানে উন্নীত করতে, 'পুরাণের কল্পিত কাহিনী'র গ্রহণ এবং এগুলোকে ঐতিহাসিক ঘটনা হলে উপস্থাপন করে। তাদের সম্পূর্ণ পশ্চাদমুখী দাবি হল— নতুন করে আর কোন কিছু আবিষ্কার করার নেই সবকিছুই অতীতে আমাদের মুনিঋষিরা আবিষ্কার করে গেছেন। এটা হল বাটরা প্রবর্তিত বিজ্ঞান।

দীননাথ বাটরা আর এস এস নিয়ন্ত্রিত ইতিহাস বাঁচাও আন্দোলন পরিচালনা করছেন। 'তেজোময় ভারত' নামে তাঁর পুস্তক যেটি বর্তমানে গুজরাটের স্কুল পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে তিনি লিখেছেন, " .... আমেরিকা গাছের কোষ আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিতে চাইছে, কিন্তু সত্যি হল এই যে ভারতের ডঃ বালকৃষ্ণ গণপত মাতাপুরকর ইতিমধ্যে দেহ পুনস্থাপনের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।.... আপনারা জেনে বিস্মিত হবেন যে এই গবেষণা কার্যটিও নতুন কিছুই নয় এবং ঘটনাটি হল ডঃ মাতা- পুরকর মহাভারতের দ্বারা (পৃ: ৯২-৯৩) অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।" তিনি আরো বলেন যে গান্ধারীর একমাত্র ডিম্বকোষে যে ১০০ কৌরবের জন্ম হয়েছিল এটাই প্রাচীন ভারতে কোষ নিয়ে গবেষণার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং এটা কোন রূপকথা নয়! বাটরার বইয়ে আরো দাবি হল মহাভারতের যুগেই দূরদর্শনের অস্তিত্ব রয়েছে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে ধারাভাষ্য সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে দিয়েছিল সেটাইতো দূরদর্শনের অস্তিত্বের প্রমাণ। অনুরূপভাবে, ভারতীয় রূপকথায় গণেশের মাথায় হাতির মাথা প্রতি-স্থাপনা কসমেটিক শল্য চিকিৎসারই অঙ্গ।

বিজ্ঞান সম্পর্কে বাটরার এই অভিমতের স্বীকৃতি মেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যে। গতবছর রিলায়েন্স গোষ্ঠীর একটি নতুন শাখা হাসপাতালের উদ্বোধনী সভায় নরেন্দ্র

মোদি তাঁর বক্তৃতায় দাবি করেন প্রজনন বিদ্যা এবং দেহ প্রতিস্থাপন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন, " আমি যা বলতে চাই তা হল আমাদের এমন একটি দেশ যার এই সকল কিছু করার সামর্থ ছিল। আমাদের সেসবের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।"

বিজ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই, শুধু সংস্কৃত পাঠ করলেই চলবে। জ্ঞানের নতুন করে বিকাশের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র 'প্রাচীন' জ্ঞানের পুনরুদ্ধার করলেই যথেষ্ট। বিস্ময়ের কোন অবকাশ নেই মোদির শাসনে ক্রমবর্ধমান বিজ্ঞানে বাজেট কর্তন করা হচ্ছে।

অবাক হবার কারণ নেই যে বিজেপির কর্মসূচীতে সংস্কৃত বিভাগকে বর্তমানে বিজ্ঞান থেকে প্রাচীন ভারতে ইতিহাস গবেষণার 'কর্তৃত্বের অধিকার' প্রদান করা হয়েছে। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র সংস্কৃত বিভাগ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান বিষয়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময় একটি বিশেষ অধিবেশনের আহ্বান করে এবং ঘোষণা করে যে ঋগ্বেদ হল ৫০০০ থেকে ১০,০০০ বছর প্রাচীন এবং আর্যরা বিদেশ থেকে ভারতে আসেনি।

হিন্দুত্ববাদী শক্তি চাইছে, প্রামাণ্য দলিলের পরিবর্তে 'বিশ্বাস' কে প্রতিষ্ঠিত করতে। বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রূপকথা এবং উদ্ভট কল্পনাকে 'প্রকৃত' অতীত বানাবার প্রচেষ্টা হচ্ছে। বর্তমান ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের প্রধান ওয়াই এস রাও এই কারণেই প্রচার করেন যে বেদ, রামায়ণ এবং মহাভারতকেই প্রামাণ্য দলিল হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, অন্যান্য দলিল পত্রাদি — সে ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং রচিত গ্রন্থাদি যাই হোক না কেন যদি এই সকল ধর্ম গ্রন্থাদির প্রতি দ্বিমত পোষণ করে তাহলে সেগুলোকে উপেক্ষা করতে হবে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাপ্ত দ্রব্যাদির কালনির্ণয়ের রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগে প্রমাণিত হয় যে বৈদিক সভ্যতা ৩৫০০ বছরে প্রাচীন। কিন্তু এই সকল প্রামাণ্য দলিলপত্রাদি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে কারণ প্রচালেত মৌখিক কাহিনী মতে এই সভ্যতা ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ বছরের প্রাচীন।

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভের জন্য, প্রামাণ্য দলিল পত্রাদির সযত্ন চর্চা প্রয়োজন যাতে কিভাবে মানুষ জীবন যাপন করত এবং কিভাবে সমাজের বিবর্তন হয়েছে সেসবের বর্ণনা থাকবে। সাহিত্য- মৌখিক বা লিখিত যাই হোক না কেন, অন্যান্য প্রামাণ্য দলিলের সাহায্যে যাচাই করে সেগুলোকে বৈধ করে নিতে হবে। অন্যান্য বিষয়ের মত ইতিহাসও যথাসম্ভব একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানযোগ্য বিষয়। ইতিহাস শুধুমাত্র অতীত গৌরব গাঁথা নয়, ইতিবাচক কি নেতিবাচক সব ধরনের বিকাশের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা- নিরীক্ষার বিষয় এটি। এই জন্যই দীননাথ বাটরা বা ওয়াই এস রাও সেই অভিশপ্ত ব্যক্তি যাদের কর্মসূচীতে বা গৃহীত প্রকল্পে বিশ্বাস ভিন্ন সত্য প্রতিষ্ঠার কোন উদ্দেশ্য নেই। পৌরাণিক হিন্দু অতীতের

বিশ্বাসই হল একমাত্র গৌরব।

এই ধরণের চিন্তা-ভাবনায়, বাস্তবকে রূপকথার মুখোস পরিণয়ে দেওয়া হয়। এটা শুধু ইতিহাস নয়, বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রকেও ধ্বংস করছে। শুধুমাত্র মহান আবিষ্কারসমূহই নয়, তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের জীবিকার্জন, শ্বাস প্রশ্বাস, সেই বিজ্ঞান এবং গণিতের ইতিহাসকে ওরা ধ্বংস করে দিচ্ছে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পড়ে সাধারণ প্রাচীন কিছু জ্ঞানের পুনরাবিষ্কারের জন্য।

ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রকৃত ইতিহাস

প্রাচীন ভারত কিভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং ভাষাসাহিত্যে বিশাল অগ্রগতি ঘটিয়েছিল তা প্রদর্শনের মতো প্রচুর প্রামাণ্য দলিল রয়েছে। ঐসময় ভারত ধাতু বিদ্যায় দারুণ অগ্রগতি লাভ করে এক বিশেষ ধরণের উন্নতমানের ইস্পাত তৈরি করে। ইউরোপে যা দামাস্কাস ইস্পাত নামে পরিচিত ছিল তার চাইতেও এই ইস্পাত এতটা উন্নত ছিল যে ইউরোপ তখনও তা উৎপাদন করতে পারেনি।

ভারতীয় গণিত শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় অবদান হল অন্যান্য গাণিতিক সংখ্যার মত শূন্যের ব্যবহার এবং এর দ্বারা গাণিতিক কাজকর্ম করা। ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে আর্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিষ্কারভাবে সংখ্যার স্থানীয় মান সূত্রায়িত করেন। তার সূত্রটি হল 'স্থানম্ স্থানম্ দশঃ গুণম্' অর্থাৎ স্থানান্তরে প্রতিটি সংখ্যা দশ দিয়ে গুণ্য হয়। পেশোয়ারের নিকট প্রাপ্ত ভকশালী পান্ডুলিপি দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতকের পুরানো, যদিও প্রকৃত পান্ডুলিপিটি আরো পুরানো সাহিত্য বলে মনে হয়। এটা অঙ্কপাতনের স্থানীয় মাননির্ধারণে ব্যবহৃত হয়।

আর্যভট্টের সমসাময়িক তরুণ বরাহমিহির প্রথম গাণিতিক প্রয়োগে শূন্যের ব্যবহার করেন। স্বভাবতই, আমরা ব্রহ্মগুপ্তের নিকট ঋণি কারণ শূন্য একটি সংখ্যা রূপে ব্যবহারে গাণিতিক সূত্রায়ণের নিয়ম তিনি উদ্ভাবন করেন। তিনি যখন শূন্য দিয়ে যোগ, বিয়োগ এবং গুণের সঠিক সূত্রায়ণ করছিলেন, তখন শূন্য দিয়ে ভাগ প্রক্রিয়ার কাজে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এর নিজস্ব প্রয়োগ বন্ধ করে গণিত শাস্ত্র বর্তমানে এই সমস্যার সমাধান করেছে। এটা আকর্ষণীয়ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে বর্তমানে সংখ্যাগুলোর নিজস্ব প্রতীকের ব্যবহারও ভারতেরই অবদান। ব্রাহ্মী লিপিতে এর সংখ্যাগত ব্যবহার থেকেই এটি এসেছে। প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী লিপির ব্যাপক ব্যবহার হত যাতে জৈন ধর্মাবলম্বীরা বহু গণিত শাস্ত্র রচনা করেছিলেন।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের মত ইউরোপকেন্দ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্রগুলিও অন্যান্য দেশে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

পিথাগোরাসের উপপাদ্য

পিথাগোরাসের উপপাদ্য সম্পর্কেও ঠিক একই দাবি করা হয়। পিথাগোরাস ছিলেন একজন গ্রিক গণিতজ্ঞ তিনি এই সূত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেন। এর সবচেয়ে জনপ্রিয় গবেষণা-পত্রে বলা হয় যে একটি সমকোণী ত্রিভূজের অতিভূজে (সমকোণের বিপরীত বাহুতে) অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপর দুই বাহুতে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান। স্বভাবতই, ভিন্নভাবে হলেও অন্যান্য দেশও এই ধারণার সঙ্গে পরিচিত। ভারতে 'সূলব- সূত্রে' এই বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির জন্য কিভাবে বেদি নির্মাণ করা হত সেই সম্পর্কে এই বই থেকে জানা যায়। চারটি গুরুত্বপূর্ণ সুলব সূত্র রয়েছে— বুদ্ধায়ন (৮০০ খ্রি: পূ:), অপস্তম্ভ (৬০০ খ্রি: পূ:), মানভ (৭৫০ খ্রি: পূ:) এবং কাত্যায়ণ (২০০ খ্রি: পূ:)।

সুলভ সূত্রসমূহ আমাদেরকে উপপাদ্য বিষয়ে বিভিন্ন সূত্র দিয়েছে যাতে ত্রিভুজের পরিবর্তে চতুর্ভূজ আলোচিত হয়েছে। সুলভ সূত্র থেকে এটি পরিষ্কার যে লেখক সমকোনী ত্রিভুজের তিনবাহুর সঙ্গে জ্যামিতিক সম্পর্ক বিষয়ে অবহিত ছিলেন। পিথাগোরীয় ত্রয়ী নামে পরিচিত তিনটি স্বাভাবিক সংখ্যা বিষয়েও তাঁর জ্ঞান ছিল যা এই জ্যামিতিক সম্পর্ক নির্ণয় সম্পর্কে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

পিথাগোরাসের এই উপপাদ্য শুধুমাত্র ভারত এবং গ্রিক দেশেই পরিচিত ছিল না, ব্যাবিলন, চিন এবং মিশরেও ভূমির পরিমাপ, ধর্মীয়- অবয়ব নির্মাণ (মিশরের পিরামিড ও ভারতে যজ্ঞের বেদি) এবং ক্যানাল (ব্যাবিলন) নির্মাণে এর ব্যবহার হত। সুলভ সূত্র রচিত হবার পূর্বেই ১৮০০ খ্রি: পূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয় ফলকগুলো খোদিত হয়েছিল ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এসব কাজেও পিথাগোরীয় ত্রয়ী এবং পিথাগোরীয় উপপাদ্য সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। এটাও জানা যায় যে ব্যাবিলন এবং মিশরের মধ্যে পণ্য, জ্ঞান এবং সাহিত্যের বিনিময় হত। হয় ব্যাবিলনের মাধ্যমে নয়তো নিজস্ব সূত্রে মিশরীয়রা পিথাগোরাসের উপপাদ্য সম্পর্কে অবহিত ছিল। জানা যায় যে পিথাগোরাস তার প্রথম জীবনের একটা বিশেষ সময় মিশরে কাটিয়েছিলেন এবং মিশরীয় গণিত বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। চিনারাও পিথাগোরাসের উপপাদ্য বিষয়ে অবহিত ছিল, চিন দেশে এটি কোও - কু উপপাদ্য নামে পরিচিত ছিল।

পন্ডিত মহল একমত যে বিভিন্ন শিক্ষিত সমাজ পিথাগোরাসের উপপাদ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। আলোচ্য বিষয় হল এই যে বিভিন্ন দেশ একই সঙ্গে হয় স্বাধীনভাবে নয়তো পরস্পরের সঙ্গে আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে নতুন আবিষ্কারের কাজ চালাচ্ছিল। প্রাচীন কালে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সেই সব মহান আবিষ্কারের জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে ভারতবর্ষই একমাত্র সমস্ত জ্ঞানের উৎসমুখ ছিল আর যা কিছু করা হয়েছিল

বৈদিক গণিত শিক্ষাদানের জন্য। আর জ্ঞানের অন্যান্য যে সকল শাখা রয়েছে এবং প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ যে স্মরণীয় পরিবর্তন এনেছিলেন সবই কি বিজ্ঞানের মূল নীতির বিরুদ্ধে ছিল?

বৈদিক গণিতশাস্ত্র এবং শিখন নীতি

পুরির শঙ্করাচার্য 'বৈদিক' গণিত শব্দটি আখ্যায়িত করেছেন বলে স্বামী ভারতী কৃষ্ণ তীর্থজী দাবি করেন। অধ্যাপক এস জি দানি এবং অন্য আরো অনেকে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন গণিত কিংবা বৈদিক গণিত বলে কিছু নেই এটা কতকগুলো কলাকৌশল এবং গণনা সংক্রান্ত গিমিকমাত্র। আমরা যতদূর জানি এর সঙ্গে গণিতের কোন সম্পর্ক নেই। আর বর্তমান ক্যালকুলেটর এবং কম্পিউটারের যুগে এসবের মূল্য কমই। অথর্ব বেদ বেদের সম্পর্কে এমন কোন রচনা বা সাহিত্য এখনও পাওয়া যায়নি।

হিন্দুত্বাদীদের জন্য অতীতে রূপকথা হল ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া জ্ঞানভান্ডার যাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে। প্রকৃত ইতিহাস হল চলমান প্রগতির ইতিহাস। সুলভ সূত্রের চারটি সংস্করণই পৃথকভাবে চিহ্নিত নয়— যেখানে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক জ্ঞানের বিকাশের কোন পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যেতে পারে। অপরদিকে ১০- সংখ্যাকে ভিত্তি করে গণিত স্থানীয় মানের পদ্ধতি নির্ধারণে অগ্রসরমানতা প্রদর্শন করে বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্ত যেভাবে শূন্যকে একটি সংখ্যা হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

পিথাগোরাসের উপপাদ্য এবং সংখ্যা পদ্ধতির বিকাশ এটাই প্রমাণ করে বিজ্ঞান এবং গণিতের ইতিহাস কেউই প্রথম সৃষ্টি করেন নি এটা হয়েছে ব্যাপক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং সভ্যতার প্রতিটি ধাপের অবদান রয়েছে এর পেছনে। যারা এবিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার এটা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইতিহাস সম্পর্কে হিন্দুত্ব আধিপত্যবাদের মতপার্থক্য কোথায়

বর্তমান হিন্দুত্বের প্রচারকরা ভিন্ন ভারতীয় বিজ্ঞানের বাইরের জ্ঞান আহরণে কোন দ্বিধা ছিল না। বরাহমিহির (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক) তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান সংগ্রহ 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থে পৌলিসা এবং রোমাকা এই দুই বিদেশীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। অনুরূপভাবে প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্রেও ব্যাবীলনের প্রভাবের কথা স্বীকৃত হয়েছে।

পরবর্তীকালে মধ্যযুগে, আরবরাই ভারতীয় গণিত, মহাকাশবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র পশ্চিম এশিয়ার প্রচার করে। ঠিক আমাদের প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মত আরবরাও যেকোন স্থান থেকেই জ্ঞান আহরণে দ্বিধাবোধ করত না। অষ্টম শতকে ফজারি জ্যোর্তিবিজ্ঞানে ভারতীয় পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। সিন্ধিয়ান ভাষায় তিনি ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মসুপ্তসিদ্ধান্ত' গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। আল খয়ার্জমি ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ে 'কিতাব আল-গাম', 'ওয়া-আল-তাফরিকবাই, 'ইসাবল-হিন্দ'- নামে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন যেগুলো ল্যাটিন

ভাষায় 'আলগোরিতমি ডি নিউমারো ইন্দোরাম' নামে অনুদিত হয়েছিল। পিসা-র লিওনার্দো তাঁর লিবের আবাসি গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করেন।

মধ্যযুগে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে কিন্তু হিন্দুত্বের আধিপত্যবাদ এই অগ্রগতি মানতে রাজি নয়। মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে ভারতে স্থাপত্য বিদ্যার অগ্রগতিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। সত্যিকারের আর্ক এবং গম্বুজ নির্মাণের সামর্থ অর্জন করে ভারত। কাগজ ব্যবহারের জনপ্রিয়তা, কাপড় সেলাই অন্ত- নির্বদ্ধকরণ, পদ্ধতি, ধাতু- সেচের কাজে গভীর কূপ খননে পার্শিয়ান চাকার ব্যবহার, বস্ত্রবয়ন শিল্পে নতুন তাঁতের ব্যবহার ইত্যাদিতে বিদেশী প্রযুক্তি প্রয়োগে ভারত যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

বিমান চালন বিদ্যা এবং রকেট বিদ্যায় ভারতের অবদান

রকেট বিদ্যার অগ্রগতিতে হায়দার আলি এবং টিপু সুলতান ছিলেন পথপ্রদর্শক। অ্যাংলো মহিশূর যুদ্ধে এরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম কার্যকরীভাবে রকেট ব্যবহার করে। ১৯৮৫ খ্রি: ভারতীয় মহাকাশযান বিদ্যার জনৈক চুড়ামনি রোদ্দাম নরসিম্ভা তাঁর একটি গবেষণা পত্রে ভারতে রকেট বিদ্যার বিকাশে হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। ভারতের বর্তমান সাংস্কৃতিক মন্ত্রী মহেশ শর্মার মতে আবদুল কালাম ছিলেন প্রকৃত একজন 'জাতীয়তাবাদী', মুসলিম নন। আবদুল কাখাম তাঁর আত্মজীবনীতে ভারতে রকেট বিদ্যায় হায়দার আলি এবং টিপু সুলতানের অবদানের কথা বলেছেন।

রোদ্দাম একাদশ শতকে চিনে গোলারারুন্দ এবং রকেট আবিষ্কারের কথা বলেন এবং এটাও উল্লেখ করেছেন কিভাবে এই সকল আবিষ্কার ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। ত্রয়োদশ শতকে কামানের আবিষ্কারের পর রকেটের ব্যবহার কমে যায়।

রোদ্দাম রকেট বিদ্যায় হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের অনবদ্য অবদানের কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে ওরা বাঁশ বা কাগজের খাপের পরিবর্তে রকেটে ধাতুর খাপ ব্যবহার করতেন। এই ধাতুর খাপ লাগানোর ফলে রকেট একটা বিশাল গতি বৃদ্ধি করে ২ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারত। এই সকল রকেটের বহন করার ক্ষমতাও ছিল অধিক। রকেটের গতি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য ওরা এর সঙ্গে তলোয়ারের ব্লেড লাগিয়ে দিত যেমনটা আজকাল আমরা করছি কালিপূজোর হাওয়াই বাজীর পেছনে লম্বা কাঠি লাগিয়ে। শত্রুর মাঝে পতিত হলে এই সকল তলোয়ার অস্ত্রের কাজ করে।

টিপু ব্যাপক হারে রকেট নির্মান করেন এবং যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এগুলো ব্যবহার করতেন। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে পোল্লিলুর যুদ্ধে (দ্বিতীয় অ্যাংলো মহিশূর যুদ্ধ) ব্রিটিশ শক্তির পরাজয়ের ক্ষেত্রে এই রকেট আক্রমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চতুর্থ অ্যাংলো মহিশূর যুদ্ধে টিপুর পতনের পর ব্রিটিশরা প্রচুর পরিমাণে রকেট ইংল্যান্ডে নিয়ে যায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য। উইলিয়াম কংগ্রেভের গবেষণায় আজ আমরা যাকে রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং বলি সেটাই বেরিয়ে আসে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশরা এই প্রযুক্তিকে আরো উন্নত করে নেপোলিয়ন এবং আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে।

বিমান এবং রকেট বিদ্যায় প্রকৃত আবিষ্কারকদের অবদান অস্বীকার করে হিন্দুত্ববাদীরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। গত বছর ১০২ তম বিজ্ঞান কংগ্রেসের মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ 'সংস্কৃতের মাধ্যমে প্রাচীন বিজ্ঞান' শীর্ষক একটি অধিবেশনের আয়োজন করে। এতে দুইজন বক্তা প্রাচীন ভারতীয় মহাকাশ প্রযুক্তি নামে একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। এর মধ্যে একজন ছিলেন প্রাক্তন বৈমানিক ক্যাপটেন আনন্দ জে. বোডাস। সংবাদ মাধ্যমে তিনি বলেন, ' আধুনিক বিজ্ঞান অবৈজ্ঞানিক' এবং বৈদিক যুগে কিংবা প্রাচীন ভারতে একটি বিমান 'আকাশ পথে এক দেশ থেকে অন্য দেশে, মহাদেশ থেকে মহাদেশে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমন করত ... এবং ডান, বাম, পেছন যেকোন দিকে ঘুরতে পারত।"

বোডাসের এই দাবি সুব্বায্য শাস্ত্রী রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ 'বৈমানিক শাস্ত্র'-র উপর ভিত্তি করে। শাস্ত্রী বেঁচেছিলেন ১৮৬৬ থেকে ১৯৪০ খ্রি: পর্যন্ত আর ভরদ্বাজের জীবিত কাল ছিল কমপক্ষে ২০০০ বছর পূর্বে। একমাত্র গ্রন্থটি প্রাচীনত্বকে 'প্রামান্য দলিল' হিসাবে দাঁড় করিয়ে শাস্ত্রী দাবি করেন যে ঋষি ভরদ্বাজ তাঁর কাছে এসেছিলেন যখন তিনি 'ধ্যানমগ্ন' ছিলেন এবং পুরো গ্রন্থটি তাকে শ্রুতি লিখনের জন্য বলে যান।

বৈমানিক শাস্ত্র গ্রন্থটি ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সাইন্স-এর অ্যারোন্যাটিক্যাল এবং মেকানিকেল বিভাগের পাঁচজন বিশিষ্ট অধ্যাপক গভীরভাবে পড়েন। তাদের অভিমত হল — 'বৈমানিক শাস্ত্র' কোন প্রাচীন গ্রন্থ নয়। এটি বিংশ শতকে আধুনিক সংস্কৃতে লেখা হয়েছে এবং বৈদিক সংস্কৃতে নয়। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এটি একটি অবৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং এতে বিমানের যে বর্ণনা রয়েছে সেটি কোন কালেই আকাশে উড়বে না অর্থাৎ এর উড়ন ক্ষমতা নেই।

বিপরীতে, রোদ্দামের আলোচনা থেকে দেখা যায় কিভাবে বিজ্ঞানের ইতিহাস রচিত হতে পারে। রূপকথার গৌরব গাথায় প্রথমে দাবি করা হয়েছিল বিমান ২০০০ বছর পূর্বের (বর্তমানে এটাকে ৫০০০ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে) এটা আবার কিছু আগে পরেও হতে পারে। কিন্তু সচেতন গবেষণা এবং বিশ্লেষণে বোঝা যায় বাস্তব কি ছিল। তিনি এটিও দেখিয়েছেন যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গেই তা ঘটেছিল। তিনি দেখান কিভাবে এই ধরণের অগ্রগতি ব্যাপক বৈমানিক বিদ্যায় জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হয় এবং আমরা আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য যা করছি এটা তারই এক বিশাল অংশ বিশেষ।

ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র

ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা অথর্ব বেদে যা পাওয়া যায় এবং এ সম্পর্কে প্রামাণ্য দলিল চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতার নির্দেশিত চিকিৎসা বিধিমতে ধর্মীয় আচার এবং প্রকৃত চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। চরক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা এই দুটি চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ে ডি. পি. চট্টোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে বস্তুভিত্তিক এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনায় দেখিয়েছেন যে এদুটি গ্রন্থ অতীতে প্রাপ্ত অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে বৌদ্ধ মঠগুলোতে চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চার প্রভাবে পরবর্তীকালে গড়ে উঠে চরক চিকিৎসা কেন্দ্র।

কীভাবে বিজ্ঞান পাঠ নয়

হিন্দুত্ববাদীরা মধ্যযুগে ভারত এবং ইউরোপে প্রাচীন গ্রন্থ পড়ে ব্যাপক জ্ঞান চর্চার প্রথা ছিল বলে প্রচার করে। এর অর্থ এই যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ না বুঝে মুখস্ত করা এবং প্রকৃতির সবরকমের পরীক্ষা ও গবেষণাকে নির্বাসন দাও। কারণ এসব হল নিম্ন শ্রেণির লোকেদের কাজ, যারা ভারতে নিম্ন বর্ণ বলে পরিচিত। ইউরোপে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো প্রবাহমান সমাজের উন্নত বৈজ্ঞানিক চর্চার উপর প্রাচীন জ্ঞানচর্চাকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে; যেমনটা জাতীয় গুরুকুল গুলো করে থাকে। ঠিক একই পদ্ধতিতে তথাকথিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলো প্রাচীন ভারতীয় প্রকৃত জ্ঞান ভান্ডারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যেমন বেনারসের গুরুকুলের সারনাথের অশোকস্তম্ভ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই, তাদের সেই জ্ঞান- ভান্ডার সমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহে অশোক সম্পর্কে কোন তথ্যও নেই, অথচ অশোকের শিলালিপি সমূহ প্রায় সারা ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী গ্রন্থসমূহ ভারতে বৌদ্ধধর্মের সমস্ত জ্ঞানভান্ডার ধ্বংস করে দিয়েছে। আর সেকারণে তাদের রচিত গ্রন্থে অশোকের রাজত্বকালের কোন স্থান নেই।

এটাও অবাক হওয়ার মত যে ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব খুঁজে পাওয়া দুস্কর। এই দুটো ধর্মই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী। ফলে বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে, এগুলো ছিল লোকায়ত ভাবনার সমতুল্য যা বেদের ভাবনাকে পরিত্যাগ করে। এতে কোন বিস্ময়ের অবকাশ নেই যে এসব কিছুই ভারতীয় বিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্রকে যুক্তি এবং প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। বিপরীতে তথাকথিত বৈদিক ভাবনা শুধুমাত্র বৈদিক জ্ঞান এবং প্রাচীন বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রতারণাশ্রয়ী ইতিহাস রচনা করতে চাইছে যা দেশের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশকে ধ্বংস করে দেবে এবং আমাদের শুধুমাত্র পেছনের দিকে নিয়ে যাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর আর এস এস কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

অধ্যাপক পি. গোপীনাথ

বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই চিন্তা-ভাবনার পরিচর্যা, বহুত্ববাদী সংস্কৃতিক চর্চা, সামাজিক সাম্য এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এখন জাতি- রাষ্ট্র কর্মসূচী রূপায়ণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে বিজেপি সরকার চাইছে আর এস এস- র মাধ্যমে সঙ্ঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে।

হিন্দুজাতীয়তাবাদ এবং এর হিন্দু মহাসভা এবং আর এস এস এর মত রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিনিয়ত বিতর্ক করে যাচ্ছে যে হিন্দু প্রধান ভারতবর্ষে মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকেদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসাবে থাকতে হবে। এই সমস্ত কথাবার্তা তারা সাভারকারের, বৈরিতাপূর্ণ ভারতীয় আদর্শের কথা বলে, যে ভারতীয় আদর্শ হিন্দু প্রাধান্যের প্রচার করে। এ বিষয়গুলো হেডগেওয়ার এবং গোলওয়ালকারের রচনায় বার বার উঠে এসেছে। প্রতিবারেই যে সকল রাজনৈতিক শক্তি বহুত্ববাদী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের বিপর্যয় ঘটে এবং হিন্দু ভারতের দাবি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মত যখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার কিছু আঞ্চলিক দলের সমর্থনে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয় তখনই আর এস এস পুষ্ট সরকার উচ্চ শিক্ষার গবেষণা কেন্দ্রসমূহ এবং বিদ্যালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে হিন্দুত্ববাদের কর্মসূচী প্রচার করতে শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে যে সকল প্রতিষ্ঠানের উপর আঘাত হানা হলো সেগুলো হল ভারতের ইতিহাস গবেষণা পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং আরও কিছু প্রতিষ্ঠান।

এন ডি এ -১ নং সরকার এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন উচ্চপদে আর এস এস বিজেপিপন্থী ব্যক্তিদের বা তাদের মতবাদে বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তিবর্গকে বসায়। আর এস এস বা বিজেপি-র সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন ব্যক্তিবর্গকে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়িয়ে দেয়। বর্তমান এন ডি এ - ২ নং সরকার যেখানে লোকসভায় বিজেপি একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদের হিন্দুত্ববাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে। এখন সঙ্গীদের ইচ্ছা করলে তাড়িয়েও দিতে পারে। বর্তমানে ওদের বিভিন্ন সংগঠনে যারা সক্রিয় সদস্য এবং আর এস এস আদর্শ প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ওদেরকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হচ্ছে শিক্ষাগত এবং পেশাগত দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও। উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের প্রধান পদে ইয়েল্লাপ্রগাদা সুদর্শন রাও বা ভারতের সিনেমা এবং দূরদর্শন ইনস্টিটিউটের প্রধান পদে গজেন্দ্র

চৌহানের নাম বলা যেতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, সেইসব আর এস এস সদস্য যারা নরেন্দ্র মোদির প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন একমাত্র তাদেরকেই এই সকল পদে বসানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

যে ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানকে প্রথমেই তুলে দেওয়া হয়েছে সেটি হল ভারতের পরিকল্পনা কমিশন। এখানে মোদির পূর্বসূরি কংগ্রেস সরকার খোলা বাজার অর্থনীতির নিকট ভারতকে বিকিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে গিয়ে ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশকে পদ্ধতিগতভাবেই ধ্বংস করে পরিকল্পনা কমিশনের স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্র তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এন ডি এ-১ নং সরকারের কর্মসূচী অনুসরণ করে এই নতুন সরকার পুণরায় ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহকে আক্রমনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে।

প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ দিয়ে। এরপর একে একে ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্সড্ স্ট্যাডিস, ভারতীয় দর্শন গবেষণা পরিষদ এবং জাতীয় গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান পরিষদসমূহ যেগুলো স্বাধীন গবেষণা পরিষদ - হিসেবে মানবোন্নয়ন দপ্তরের অধীন ছিল— এই সব প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করে। এই পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারতের ইতিহাস গবেষণা পরিষদ এবং কিছুটা স্বল্প মাত্রায় হলেও ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের উপর সঙ্ঘ পরিবারের হস্তক্ষেপ মাত্রাতিরিক্ত।

আর এস এস কর্মসূচী মোতাবেক ইতিহাস মারাত্মক আক্রমণের মুখে কারণ এদের অন্যতম লক্ষ্যই হল ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের ইতিহাস সংক্রান্ত দাবিগুলো বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা -নিরীক্ষার সম্মুখে। এন ডি এ -১ নং সরকারের আমলে ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ ভারতীয় ইতিহাসের 'বিকৃতি-' কে 'সংশোধন' করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস রচনাই ওদের কাছে ইতিহাস 'বিকৃতি'। সংবাদপত্র থেকে ওরা অবগত হয় যে অধ্যাপক কে. এন পানিক্কর এবং সুমিত সরকার সম্পাদিত 'টুয়ার্ডস্ ফ্রিডম' নামে কয়েক খণ্ডে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহা রচিত হচ্ছে। আর তখনই প্রকল্পটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারা সরস্বতী নদী বিষয়েও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেটিও সাফল্য অর্জন করেনি।

এন ডিএ- ২নং সরকারের শাসনের অবসানে গঠিত নতুন পরিষদ এই সকল সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়।

এন ডি এ -২নং সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। আট জন বর্তমান সদস্য যাদের দ্বিতীয়বার পর্যন্ত থাকার যোগ্যতা রয়েছে, তাদের কাউকেই স্থান দেওয়া হয়নি। কাউন্সিলের ১৮ জন ঐতিহাসিকের মধ্যে তিন বা চারজন বাদে বাকী সবাই অখিল ভারতীয় বিচার কেন্দ্র, বিজেপি বা বিজেপি-র জাতীয় পরামর্শদান সভা কর্তৃক সমর্থিতরাই মনোনিত হয়েছেন।

ভারতীয় ইতিহাসবিদগণ যোগ্যতাহীন এবং অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নির্বাচিত করায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

নবগঠিত ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদ জোর দিয়ে বার বার বলার চেষ্টা করছে যে তাদের প্রথম কাজ হল ভারতীয় ইতিহাস লিখন পদ্ধতি থেকে 'বিকৃতি' দূর করে ভারতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপর জোর দিতে হবে। তারা ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের গঠনতন্ত্রও পরিবর্তন করতে চাইছে। কারণ অন্যান্য সব কিছুর মধ্যে ইতিহাস পরিষদ বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস রচনায় গুরুত্ব আরোপ করে এবং ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদের আদর্শ সুদৃঢ় করতে চেষ্টা করে।

এই সকল কাজ সম্পন্ন করতে এমন সব জ্ঞানী এবং গুরুদেরকে ডেকে আনা হয়েছে যাদের সঙ্গে ইতিহাসের কোন পেশাগত সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে একজন ছিলেন বেলজিয়ামের অধ্যাপক যিনি ভারতীয় ইতিহাসবিদ্দের সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন এবং অপরজন ছিলেন একজন আমেরিকান যোগগুরু যিনি জোরালোভাবে অনুভব করেন আমাদের বৈদিক যুগে ফিরে যাওয়া উচিত এবং 'ভারতীয় ইতিহাসকে লালিকরণ মুক্ত করতে হবে।" শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যে কোন ধরণের বিকল্প মতামতকে আর এস এস গুন্ডাবাহিনী দ্বারা স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

ওদের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল 'দি ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রিভিউ' নামে একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্যকে বহিষ্কার করা। তৃতীয় পদক্ষেপ হল উপদেষ্টা কমিটিকে বাতিল করে দেওয়া যার মধ্যে কয়েকজন ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক যাদের সকলে কোনভাবেই মার্কসবাদী ছিলেন না। জুন মাসে কাউন্সিলের সদস্য সচিব পদত্যাগ করেন কারণ এই সাময়িকপত্রে উপদেষ্টা কমিটি ভেঙ্গে দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর অসম্মতি তাকে নথিভুক্ত করতে দেওয়া হয়নি। রাও এবং নতুন পরিষদের সকল সদস্যগণ চাইছেন ইতিহাসের তথ্য নির্ভর গবেষণা বন্ধ করতে এবং ভারতের অতীতকে 'অবিকৃত' অবস্থায় উপস্থাপন করতে। স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এই 'নির্ভরযোগ্য' রচনা হবে বৈদিক ইতিহাসের তথ্য এবং বর্ণনা অনুসারি। এভাবেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যদিও ধর্ম এবং জাতব্যবস্থা নিয়ে বির্তক বহু বছরের পুরানো এবং এবিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ লেখালেখি হয়েছে, বর্তমানে সেসবকে আর এস এস- এর দৃষ্টিভঙ্গি মোতাবেক উপস্থাপন করতে হবে।

এর পরবর্তী পদক্ষেপ হল সংস্কৃত ভাষার উৎসগুলো কাজে লাগিয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার একটি প্রকল্পের অনুমোদন। সুব্রহ্মনিয়ম স্বামীর উপস্থিতিতে দিল্লি বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ প্রথম এই প্রকল্পটি বেসরকারিভাবে অনুমোদন করে। এই স্বামীই দাবি তুলেছিলেন বিপানচন্দ্র এবং রোমিলা থাপারের লেখা সমস্ত বই পুড়ে ফেলা উচিত। সংস্কৃত একটি অতি উন্নত ধ্রুপদী ভাষা এবং ভারতের আদি পর্বের অধিকাংশ ঐতিহাসিকই সংস্কৃত ভাষার উৎস ব্যবহার করেছেন। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে ইতিহাস গবেষণা পরিষদ এই বিতর্ক তুলেছেন যে

একমাত্র সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞরাই প্রাচীন ভারতের আয়নায় ভারতের ইতিহাসকে দেখেন না।

ভারতের ইতিহাস গবেষণা পরিষদে বর্তমানে কোন স্থায়ী সদস্য সচিব নেই, চেয়ারম্যান নিজেই তার কাজ সামলান। পরিষদের আইনসিদ্ধ কমিটির সভার অনুলিখন এর ওয়েবসাইটে দেখা যায় না। সম্ভবত, ভারতীয় ইতিহাস বিকৃতির সংশোধনী লিখন চলবে অতি গোপনে।

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ গঠিত হয় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। এটি পরিবর্তনের কর্মসূচীও গ্রহণ করেছে সরকার। এর সংবিধান সংশোধন করতে গিয়ে সরকার বুঝতে পারছে যে ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের মত এটাকে প্রশাসনিক পর্যায়ে আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। পরিবর্তিত আইন মোতাবেক বর্তমান সদস্যদের মধ্য থেকেই মনোনিত সদস্যদেরকে নিতে হবে এবং এর সঙ্গে যুক্ত পুরানো জাতীয় অধ্যাপকদেরকেও স্থান দিতে হবে। সমবেত বাদকদলের মত বিরাট সংখ্যায় শিক্ষাবিদ নিয়োগ করা বিজেপ-র পক্ষে কঠিন কাজ। সেই জন্য স্থায়ী সদস্য সচিব ভিন্ন, অন্য সদস্যদের নিয়োগে ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। বর্তমান চেয়ারম্যান বিজেপি'র নিয়োজিত নন। ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের মত আর এস এস এবং বিজেপি সরাসরি ভারতীয় সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কব্জা করতে পারেনি কারণ এই বিষয়ের গবেষণায় বাণিজ্য বিষয় থেকে ভূগোল এবং অর্থবিদ্যার প্রয়োজন। এই সকল বিষয়ে ইতিহাসের মত হিন্দু রাজনীতির কোন আশু প্রভাব নেই।

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। এটি অপর একটি প্রতিষ্ঠান যার প্রতি আর এস এস বিজেপি-র দৃষ্টি আপতিত হয়। এন সি ই আর টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সাতটি প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় প্রেক্ষিতে নতুন সমন্বিত রূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে যা হবে উচ্চবর্গীয় উপনিবেশিক শিক্ষার বন্ধনমুক্ত। জাতীয় স্তরে বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম তৈরি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্বও অর্পণ করা হয় এর উপর। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এন সি ই আর টি বিজেপি শাসনে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে। এদের বিগত শাসনকালেই এন সি ই আর টি বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করে। বিজেপি শাসনের অবসান ঘটলে এই কাজটি অসমাপ্ত থেকে যায়। আজ বিজেপি এবং আর এস এস অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে পুণরায় এন সি আর টি কে তাদের নির্দেশিত পথে চালাতে চাইছে। অধিকর্তা অধ্যাপক প্রবীন সিনক্লেয়ারের বিরুদ্ধে মন্ত্রীর পক্ষ থেকে দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এমন সময় তাঁর অপসারণ ঘটে যখন জাতীয় পাঠ্যক্রম রচনা সংক্রান্ত বিষয়ে ২১টি কমিটির পর্যালোচনার মধ্যবর্তী সময়। আর এস এস-র দীননাথ বাটরা ইতিপূর্বে সরকারের সঙ্গে কথা না বলে দ্রুত এই কাজে হাত দেওয়ার জন্য এন সি ই আর টি-র তীব্র সমালোচনা করে। ঔৎসুক্যের বিষয় হল, এই প্রতিষ্ঠানে এখনও কোন অধিকর্তা নেই। ইতিমধ্যে এরা অনুর্দ্ধ আশি বছরের অন্বা চরন বৈশিষ্ট্যকে এন সি ই আর টি-র প্রকাশনা বিভাগের পরামর্শদাতা নিয়োগ করেন। বৈশিষ্ট্য এর আগে বিজেপি-র 'ফসল সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় টিমে ছিলেন এবং তিস্তা শীতলবাদকে আক্রমণ করে রচিত একটি গ্রন্থের সম্পাদক তিনি।

মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অপর একটি প্রতিষ্ঠান। জহরলাল নেহরু ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানবার আগ্রহ বৃদ্ধিতে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যাতে স্বল্প মূল্যে ভাল সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে। মালয়ালম ভাষার প্রসিদ্ধ লেখক এ সেতুমাধবন ছিলেন আইনসিদ্ধভাবে এর নিযুক্ত চেয়ারম্যান। তিনি সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারেও ভূষিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কার্যকালের সীমা শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। তাঁর স্থানে যাকে চেয়ারম্যান পদে বসানো হয় তিনি হলেন আর এস এস পরিচালিত 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। অসম গণপরিষদের এক নেতা যিনি বিজেপি- তে যোগদান করেন তাঁর স্ত্রী রীতা চৌধুরী যার সঙ্গে এই বিষয়ের সম্পর্কই নেই তাকে সংস্থার অধিকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়। দেখা যায়, এই পদের জন্য পূর্বে অন্যান্য অনেক প্রতিযোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হন।

৮৭ বছরের বৃদ্ধ লোকেশ চন্দ্র ছিলেন 'ভারতীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ' পরিষদের প্রধান মোদিকে যিনি 'ভগবানের পুনর্জন্ম' বলে বর্ণনা করেছেন। রামায়ণ এবং মহাভারতের উপর ভিত্তি করে চন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টি দেখবেন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে আই সি সি আর কর্তৃক মস্কোতে "সংস্কৃত এবং ভারতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যবিষয়ে পঠন, রাশিয়া এবং প্রতিবেশি দেশসমূহ ঃ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটি কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। এই কনফারেন্সের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল "প্রতিবেশি দেশসমূহের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার যে সমস্ত জ্ঞানভান্ডার রয়েছে সেগুলোর ব্যবহারের পন্থা এবং উপায় বের করা।" এই সম্মেলনে ভারতীয় সমন্বয়কারী ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান যাকে আবার ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদের পক্ষ থেকে সংস্কৃত ভাষায় থাকা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে ভারত ইতিহাসের পুনর্লেখনের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ বিজেপি- আর এস এস- র রাজনীতির পক্ষে সুবিধাজনক ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ অযোধ্যায় অপেশাদারি পদ্ধতিতে বেশ কয়েকটি খনন কার্য চালিয়েছে বাবরি মসজিদের স্থলে মন্দির আবিষ্কার করবার জন্য। যদিও সেখানে কিছু পাওয়া যায় নি। প্রতিবারেই বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালায়ের অধীনে এনে সরস্বতী নদীর অনুসন্ধান পর্ব চালানো হয়। এন ডি এ -১ নং সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর সরস্বতী নদী অনুন্ধান প্রকল্প বাতিল হয়েছিল। বর্তমান সরকার পুণরায় এই অনুসন্ধান প্রকল্প চালু করে। বিজেপি- আর এস এস এতটাই সরস্বতী নদী খুঁজে বার করতে মরিয়া যে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ যখন উত্তর- পশ্চিম সীমান্তে হকরা যাগ্গর নদীর অববাহিকায় খনন কার্য চালাচ্ছিল সেই সময় কেন্দ্রীয় জল সম্পদ, নদী উন্নয়ন এবং গঙ্গা পুনরুজ্জীবন মন্ত্রী কেন্দ্রীয় জল বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এলাহাবাদ দুর্গের পার্শ্ববর্তী কোন কূপের জল পরীক্ষা করে প্রচেষ্টা চালাতে যাতে করে হারিয়ে

যাওয়া সরস্বতী নদীর কোন উৎস চিহ্নিত করা যায়।

সংস্কৃতি মন্ত্রক হল ভারতের জাতীয় মহাফেজ খানা এবং নেহরু স্মারক মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগারের পরিচালন মন্ত্রক। এন এস এম এল অধিকর্তাকে জোর করে পদত্যাগ করানো হয়েছে অথচ জাতীয় মহাফেজ খানার এখনও কোন প্রধান নেই। ললিত কলা একাডেমীর প্রধানকেও অসম্মানিত করে তাড়ানো হয় এবং এই সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানটি এখন চেয়ারপার্সনহীন।

দেশের খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান 'ভারতের চলচ্চিত্র এবং দূরদর্শন সংস্থার' প্রধান পদে দূরদর্শনের পৌরাণিক সিরিয়ালে অভিনয় করে এমন বি - গ্রেড অভিনেতাকে বসানোর প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সরকার নির্লজ্জভাবে আক্রমণ করে। গজেন্দ্র চৌহানকে নিয়োগের প্রতিবাদে দীর্ঘ চার মাসব্যাপী চলা ছাত্র আন্দোলন সম্প্রতি সরকারের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নিষ্ফল আলোচনার পর বাতিল করা হয়।

হিন্দুত্বকরণের কাজে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যবহারে সরকারের মরিয়া প্রচেষ্টা মারাত্মক পর্যায়ে পৌছায়। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা হয়েছিল বহুত্ববাদী জাতীয় সংস্কৃতিকে পুরিপুষ্ট করার জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের দ্বারা। কিন্তু এগুলো এখন প্রাতিষ্ঠানিক বিলুপ্তির সম্মুখীন। বর্তমানে ভারতের সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্মকে রাষ্ট্রীয় এজেন্সির দ্বারা সংকোচিত করা হচ্ছে। হিটলারী কায়দায় সহজেই এদের তুলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং এদের বৈজ্ঞানিক ধ্যান - ধারণা যুক্ত কাজকর্ম সীমিত করা হচ্ছে। যাতে করে জনগণের মানসিক জগতে পরিবর্তন আনা যায় এবং একাজে বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পজগতের লোকেদের একটি ক্ষুদ্র অংশেরও সমর্থনের প্রয়োজন নেই।

এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের ব্যাপক কাটছাঁট করা হয়েছে এবং কাজের পরিধিও সীমিত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো হল— বিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা, কলা বিভাগের গবেষণা, সমাজবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান প্রকাশনা বিভাগের অনুদানে, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, ঐতিহ্যবাহী স্থান ও স্মৃতিসৌধের সংরক্ষণ, গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ, যাদুঘর এবং মহাফেজখানা, বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুদান ও ছাত্রদের স্টাইপেন্ড এবং ফেলোশিপ, বিশেষ প্রকাশনার জন্য প্রকাশকদের ছাড় প্রদান, ভারতের সরকারি গ্রন্থাগার এবং বিদেশ রাষ্ট্রদুতের কার্যালয়ের গ্রন্থাগার সমূহ, যুব কর্মসূচি এবং খেলাধুলা, শিশু এবং নারীকল্যাণ এবং আরও অনেক কিছু। এই কাজের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রাধিকার এবং নীতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে জ্ঞান বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলোও সংঘ পরিবারের কর্মসূচির স্বপক্ষে মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত হয়। আর ওদের সমস্ত কাজকর্মই ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, সংখ্যালঘু, শোষিত এবং প্রান্তিক অংশের মানুষের স্বার্থরক্ষায় সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতাকে উপেক্ষা করে। বিজেপি সরকারের এই ধরণের কাজে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতার ফলে হাজারো পেশাধারী, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বুদ্ধিজীবীদের সংকট সৃষ্টি করবে।

'নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ'— আর এস এস পন্থা

কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র শংসাপত্র প্রদান বোর্ড

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে পহলাজ নিহালিনি 'হর হর মোদি, ঘর ঘর মোদি' স্লোগান তুলেছিলেন। ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁকে কেন্দ্রীয় শংসাপত্র প্রদান বোর্ড-এর চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হয়। তাঁর পূর্বসূরী লীনা সামসন ঐ পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন কারণ বিভিন্ন হিন্দুত্বাবাদী গোষ্ঠীগুলো তার কাজে সন্তুষ্ট ছিল না।

প্রসার ভারতী

দিল্লিভিত্তিক আর এস এস শীর্ষ চিন্তক এ. সূর্য প্রকাশ বিজেপি-পন্থী সংবাদপত্র পাইওনিয়ারের বিশেষ পরামর্শদাতা সম্পাদক এবং বিবেকানন্দ ফাউন্ডেশনের একজন ফেলো, প্রসার ভারতীয় প্রধান পদে নিযুক্ত হয়েছেন। প্রসার ভারতী হল এমন একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা যা দূরদর্শন এবং আকাশবানী পরিচালনা করে।

জাতীয় শিক্ষক শিক্ষণ পরিষদ (NCTE)

এই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশের শিক্ষক পশিক্ষণের কলেজগুলো পরিচালনা করে। বিভিন্ন আর এস এস পন্থী গোষ্ঠী দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা ক্ষমতা হস্তগত করা হয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ওরা সারঙ্গপানি এবং ভার্জিনিয়াস জাজা-র অপসারণের জন্য চাপ দিচ্ছে কারণ তাঁরা উদারবাদী প্রগতিশীল।

এন সি ই আর টি

এই সংস্থাটি বিদ্যালয় পাঠ্যক্রম তৈরি করে। বিদ্যালয় শিক্ষা বিষয়ক এই উচ্চ প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা ছিলেন পারভিন সিনক্লেয়ার। এই পদে তাঁর মেয়াদ উর্ত্তীণ হওয়ার দু'বছর আগেই ২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি পদত্যাগ করেন। তাঁর বিরুদ্ধে নানাবিধ অনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়েছিল। তার অপসারণের ফলে জাতীয় পাঠ্যক্রম কর্মসূচি, ২০০৫ (NCF-2005)-এর পর্যালোচনার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পথে। উপযুক্ত প্রার্থী অনুসন্ধানের কাজটি এখনও চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্মত্য সেন ছিলেন বিহারে অবস্থিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত) চেন্সেলর, বিজেপি -র চাপের ফলে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। এক খোলা চিঠিতে তিনি বলেন যে বোর্ড তাঁকে স্বপদে রাখতে চাইলেও সরকার চায় নি।

রাজস্থানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে সমস্ত উপাচার্যগণ সরাসরি সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত নয় তাদের কাজ করতে অসুবিধা হয়। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. দেব স্বরূপ জনসমক্ষে অভিযোগ করেন যে আর এস এস -র মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপের দরুণ তিনি কাজ করতে পারছেন না। সার্চ কমিটি কৈলাশ সোধানী নামে একজন আর এস এস পন্থীকে উপাচার্য হিসাবে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে বেছে নেয়। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন সিন্ডিকেট সদস্য হলেন আর এস এস পন্থী অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত।

২০১৪-এর ২৪ নভেম্বর গিরিশ চন্দ্র ত্রিপাঠি নামে একজন আর এস এস কর্মকর্তাকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ করা হয়। মদন মোহন মালব্যের নাতি অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গিরিধর মালব্যের নেতৃত্বে গঠিত সার্চ- কাম - সিলেকশন কমিটি তাঁর নাম অনুমোদন করে। এই গিরিধর মাল্য ছিলেন বেনারসে নরেন্দ্র মোদির প্রার্থীপদের প্রস্তাবক। সংবাদ মাধ্যমের ভাষ্য অনুযায়ী মালব্য এবং ত্রিপাঠি ছিলেন পুরানো বন্ধু।

হরিয়ানার বিজেপি সরকার পূর্বতন সরকারের গঠিত সমস্ত সাহিত্যিক একাডেমিগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানে অতি শীঘ্রই তাদের পছন্দের লোক নিয়োগ করা হবে।

এন আই টি, নাগপুর

বিশ্রাম রামচন্দ্র জামাদার নামে একজন নিবেদিত আর এস এস স্বয়ংসেবককে নাগপুরের বিশ্বরাইয়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র প্রধান পদে নিয়োগ করা হয়। এমনকি এই পদের জন্য মনোনীত চার জনের প্রার্থী তালিকায় তার নাম ছিল না।

টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ (TIFR)

এই বছরের প্রথম দিকে ' টেকনিক্যাল গ্রাউন্ড'-র প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে পদার্থবিদ্যায় তাত্ত্বিক সন্দীপ ত্রিবেদীর নিয়োগ বাতিল করে দেন। এই প্রথম বারের মতো প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কোন অধিকর্তার প্রদত্ত নিয়োগপত্রে ভিটো প্রদান করা হয়। ত্রিবেদী হলেন প্রথম শ্রেণীর একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের বিশারদ এবং বহু সম্মানীয় পুরস্কার অর্জনকারী। ভারতরত্ন উপাধি প্রাপক এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ড. সি এন আর রাও -এর মনোনয়নও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপে আটকে আছে। কিন্তু এখনও কোন সাড়া নেই। রাও-এর অভিযোগ যে ব্যাঙ্গালোরভিত্তিক জওহরলাল নেহরু সেন্টার ফর এডভান্সড সাইন্টিফিক রিসার্চ-এ তার নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

আই আই টি

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী অনিল কাকোদকর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, মুম্বাই-এর পরিচালনা কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, রোপা, ভুবনেশ্বর এবং পাটনা আই আই টি-র জন্য অধিকর্তা নির্বাচনে মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে তিনি পদত্যাগ করেন। মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সিদ্ধান্ত পূর্বেকার বাছাই প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং ৩৭ জন পদপ্রার্থীর সকলকেই পুনরায় বিবেচনার জন্য সার্চ- কাম- সিলেকশন কমিটির সামনে হাজির করানোতে ঐ কমিটির হস্তক্ষেপে মন্ত্রকের পছন্দমত তালিকা প্রস্তুতের চেষ্টা করা হয়।

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর এডভান্সড্ স্ট্যাডিস, সিমলা

গত বছর মে মাসে বিজেপি-র নির্বাচনী বিজয়ের পর গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী অনতিবিলম্বে আই আই এ এস-র চেয়ারপার্সন পদত্যাগ করেন। সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন মোতাবেক, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরাণী চন্দ্রকলা পাড়িয়াকে এই পদে নিয়োগ করেন। পূর্বে যে সম্ভাব্য প্যানেল তৈরি করা হয়েছিল পাড়িয়ার নাম তাতে ছিল না।